মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

জানুয়ারী, ২০২৬
পৌষ, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

পৌষ ১৪৩২/জানুয়ারী ২০২৬

ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক বিন্যাস		৩
চৈতন্যের জীবন সঞ্চার ঃ শিবচেতনের অধিষ্ঠান	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
ভগবানই চিরন্তনী সত্য	তানিয়া ঘোষাল	১৬
কৃষ্ণ—কানাইয়া	তুলি চ্যাটার্জী	১৮
ভগবানই পূর্ণ সত্য	সায়ক ঘোষাল	২০
সবটা নিয়েই একটা রে মন	মনোজ বাগ	২১
সৃষ্টির মূলে ভগবান	রীতেন বসাক	২২
"মন চলো নিজ নিকেতনে"	পার্থ সুন্দর ঘোষ	২৩
মা-এর ভালোবাসা	প্রণবেশ রায়	২৪
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	২৫
ঋষির প্রজ্ঞা ব্রহ্মধনে নিহিত	মানবেন্দ্র ঠাকুর	২৫
Question for Divine	Sweta Kumari	২৬

সম্পাদক : রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রক : বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : ৫ টাকা

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক বিন্যাস

ভগবানই সেই আদি সনাতন ধ্রুব শাশ্বত। তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড আবার তিনি স্বয়ংই প্রবেশ করেছেন তাঁর সৃষ্টির কণায় কণায়। এই সৃষ্টির প্রতিটি প্রকাশের মধ্যেই তিনি বিরাজিত হয়েছেন প্রাণশক্তি রূপে। তবেই তো এই ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে সজীব, চলমান, গতি পেয়েছে। তারপর থেকেই নিজ ছন্দেই এগিয়ে চলেছে। মহাকাল সৃষ্টি করলেন কাল আর সেই কালের রথযাত্রায় গড়ে দিলেন জীবন গুলিকে, জীবন কালের স্রোত পথেই বয়ে চলতে লাগল, ভগবান বললেন, 'জগৎ এমনি এমনিই চলছে, কোনো কারণ নেই।' ভগবান সৃষ্টির সূচনায় গড়ে দিয়েছেন একটি সূত্র, যে সূত্র সর্বকালেই সত্য স্বরূপ হয়ে রয়েছেন। জীবনের সূত্র, জীবন-যাপনের সূত্র, কর্ম-বিচার সূত্র, ভক্তি-বিশ্বাসের সূত্র, এই সূত্রগুলি সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় এবং কালাতীত। তা ব্যতিত আর যাকিছু হয়েছে তার সবই অনিত্য এবং কালের নিয়মে বিনাশশীল। জীবন যত সময় পর্যন্ত সেই মহাকালের কাল ছন্দের সঙ্গে জুড়ে আছে ততক্ষণই জীবন চলেছে কালরথে। সেই বিচ্যুতি সেই পতন। কিন্তু পতনই বা কোথায়, পতনশীল জীবন ও গাঁথা হয়ে পড়েছে তাঁর সেই কালছন্দের নিত্য জীবন ও গাঁথা হয়ে রয়েছে তাঁর সেই কালছন্দের নিত্য নিনাদে, আর মন্দিত হয়ে চলেছে তাঁর সেই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সব জীবন ও আপাত জীবনের অস্তিত্বে এরা যেন গাঁথা হয়ে রয়েছে মহাকালের নৃত্যের ছন্দে আর সেই ছন্দেই গ্রথিত সব হৃদয়ের স্পন্দন, প্রতিটি জীবনের অভ্যন্তরে যে স্পন্দন, যে গতিময়তায় ভাস্বর হয়ে থাকা তা সেই কালেরই অনন্ত যাত্রা। প্রতিটি জীবনই তার অজান্তেই মহাকালের আংশ স্বরূপ হয়ে ভাস্মর হয়ে রয়েছে। তাই প্রতিটি জীবনই কালের সীমা পেরিয়ে হয়ে রয়েছে অনন্ত। এই অনন্তযাত্রা পথে কখনো কখনো কোনো কোনো জীবনের মধ্যে ফুটে উঠেছে ভগবানকে খোঁজার, জানার, ভালোবাসর প্রেরণা। জীবনের মধ্যে যদি জেগেছে ভগবানকে খোঁজার প্রেরণা তবেই ধরা দিয়েছেন তিনি, বুঝিয়ে দিয়েছেন জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিজ অস্তিত্বকে। জীবন যদি চেয়েছে আরো এগিয়ে যেতে তাঁরই দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে হাত ধরে নিয়েছেন জীবনের। জীবন হাত না বাড়ালেও তিনি হাত ছাড়েন না। তিনি ভক্তের সব ভার নেন, ভক্তের অজান্তেই নেন। ভক্ত বুঝতেও পারে না কবে তিনি তার সব ভার নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু যতক্ষণ জীবনের মধ্যে হিসাব থাকে, নিজস্ব ভালোমন্দের বোধ জ্বলজ্বল করে, যতদিন জীবন নিজের মানবিক ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে থাকে। যতদিন জীবন নিজের চাওয়া পাওয়াকে বেশী গুরুত্ব দেয়। ততদিন তিনি নীরবে অপেক্ষাই করেন। কোনো আরোপ করেন না। ভক্ত ভগাবানকে কতটা ভালোবাসতে পারে তা এ জীবন জানে না কিন্তু তিনি যে ভক্তকে তার কত হাজার গুন বেশী ভলোবাসেন তার পরিমাপ সম্ভব না। তবুও তার কোন আরোপ, শাসন আছে। পথ ভুল হলে বার বার ঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েও ক্লান্ত হন না তিনি। তাঁর ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গে না। জানি না ভক্ত কত না প্রতীক্ষা করতে পারে ভগবানের জন্য। কিন্তু ভগবানের প্রতীক্ষা ভক্ত হৃদয় অনন্ত। তিনি সেই সৃষ্টির আদি থেকে অপেক্ষমান হয়ে আছেন।

জগৎ-এর এই আপাত জীবনযাত্রা, যা কিনা এক অদ্ভুদ রান্নাবাটি খেলার সংসারের মতোই অনিত্য, সেই মায়াজালের মধ্যে মজে থাকা মন খোঁজা পায় না সেই তাঁরই অভ্যন্তরে চির প্রতীক্ষমান হয়ে থাকা ভগবানের। যখন খোঁজ মেলে তখন সূচনা হয় এক নতুন যাত্রা পথের। এই যাত্রা এক অনন্ত যাত্রা, আর সেই যাত্রা পথের সঙ্গী কেবল স্বয়ং তিনি। তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। জগৎ হাজার পারার থেকে একটি না পারাকেই বৃহৎ করে দেখায় আর ভগবান হাজার না পারাকে তুলে একটি বার পারাকে বেশী মূল্য দিয়ে আগলে রাখেন তার ভক্তকে। ঠাকুরের কথাতেই আছে যে ভগবান 'রাশ ঠেলে দেন।' অনেক দিনের অন্ধকার ঘরে, একবার জানলা খুলে দিলেই আলোয় আলোময় হয়ে যায়। ভগবানকে একটি বার ভাবলে ভগবান শত হাজার ভাবনার ঢেউ ঠেলে দেন ভক্ত হৃদয়। ভক্ত যখন বোঝে যে সে ভগবানের কোলেই চড়ে আছে

আর সে পড়বে না তখন চোখ ফোটে। আর সেই দৃষ্টি ও ভগবানেরই প্রদত্ত, ভগবান যেমন দৃষ্টি প্রদান করেন তেমনই দেখা হয় জীবনের। ভগবান যেমন শ্রুতি প্রদান করেন তেমনই শ্রবণ করা হয়।

ভদ্রং কর্নেভি শৃনুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেম আক্ষভি যজত্রা।
স্থিরৈ অঙ্গৈ তুষ্টুবাংস তনুভি
বশ্যেম দেবহিতং যৎ আয়ু।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

যে জীবন ভগবান ময় হয়ে আছে, সেই জীবন যা দর্শন করে তাই ভদ্র, অর্থাৎ ভগবৎ ময়, সত্য স্বরূপ ভালো, যা শ্রবণ করে তাই ভদ্র অর্থাৎ ভালো, ভাগবতী। এই দৃষ্টি, শ্রুতি বহিঃর্মুখি নয়। এই দেখা, শোনা সবটাই অন্তরের। এই জীবন ভগবৎ ময় হয়ে থাকে। কারণ তার বাক্-এ, মনে, অন্তরে ভগবান স্বয়ং অবস্থান করে আছেন। ভক্তের জীবন ভাণ্ডার যতই ভগবানে ভরে ওঠে তত ভক্তের 'আমিত্ব' অপসৃত হয়। ভক্ত হৃদয় ভগবৎভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যখন জগৎ-এর দিকে দিক্‌পাত করে তখন সে দেখে, সে জীবনের জগৎ মুখীনতা থেকে, জগৎ-এর থেকে বেশ কিছুটা ওপরে, তখন তার বাহ্যিক অবসর এক থাকলেও অন্তর অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এই বদলে যাওয়া অবয়ব জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে জগৎকে দেখতে শেখায়, যে দৃষ্টি স্থান কালের গণ্ডীকে পার করে অনন্ত ছন্দের সঙ্গে মিলিত হয়। এই দৃষ্টি ভগবানের আলোতেই ভগবানকে আলোর মালা রূপে দেখতে শেখায়, তখন তার কাছে জগৎ-এর নতুন রূপ উন্মোচন হয়। তখন সে সব কিছুর মধ্যেই ভগবানের রচনা, অস্তিত্বকে টের পায় আর এই বোধই তাঁকে ভগবানের মতো করে ভগবানকে ভালোবাসতে শেখায়। ভগবানের মতো করে ভগবানের মনকে বুঝতে শেখায়। ভগবানের মনের মতো করে ভগবানের সেবা, নিবেদন তখনই হয়ে ওঠে যথাযথ যখন ভগবানের মনকে চিনতে পারে ভক্ত। ভক্ত তখন হয়ে ওঠেন একজন ভগবৎ কর্মী, যখন তিনি জানেন যে তিনি ভগবানের এই বিশাল রাজ্যের কর্মে নিযুক্ত তখন আর ভক্তের এই জগৎ-এর কাছে কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে না। ভগবানের কাছেও থাকে না। কারণ ভক্তে একমাত্র চাওয়া ভগবৎ সঙ্গ যা তার সব সময়-এর জন্যেই পাওয়া হয়ে যায়। যে জীবন সদা সর্বদার জন্য ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে আছে তার আর কোনো চাওয়া থাকে না। এবার সে সত্যি সত্যি বোঝে যে সে মহাকালের কালরথেই বসে আছেন আর তার জীবনের সবটুকুই ভগবান গ্রহণ করেছেন। এখন সে এই অনন্ত পথের যাত্রী যে পথে ভগবানই স্বয়ং তার সঙ্গী হয়ে তাকে নিয়ে চলেছেন। এই জীবন কালসীমার মধ্যে থেকেও অনন্ত কালের যাত্রী।

তখন এই জীবনের মধ্যে ফুটে ওঠে সাম্যের দৃষ্টি। কারণ ভগবৎ দৃষ্টি তাকে বুঝিয়েছে যে সব কিছুর মধ্যেই তিনি আবস্থান করে আছেন আর তাই এই জগৎ-এর সবই তারই প্রকাশ, বিভিন্ন মাত্রায় বিধৃত হয়ে আছে। তাই জগৎ-এর প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নিরপেক্ষ থেকেও এই জীবন হয়ে ওঠে জগৎ-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জগৎ-এর প্রতিটি কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল। কারণ সে জেনেছে জগৎটা তার কাছে একটা আশ্রম যেন গুরুগৃহ, তাই জগৎ-এর সাধারণ থেকে সাধারণ কাজের মধ্যে দিয়ে সে সদাসর্বদা প্রাপ্ত হয়ে চলেছে ভগবানকে নতুন নতুন রূপে। আর নতুন করে পাওয়ার মধ্যে দিয়েই ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক নতুন নতুন রূপে হয়ে চলেছে বিন্যস্ত। হে প্রভু এই জীবনকে তোমার নিত্য সঙ্গ প্রদান করে তোমার রথেই ঠাঁই দাও।

ওঁ নমঃ শিবায়ঃ। নমঃ শিবায়ঃ। নমঃ শিবায়ঃ।

[তনিমা চ্যাটার্জী লিখেছেন এই বিশেষ সম্পাদকীয়]

চৈতন্যের জীবন সঞ্চার ঃ শিবচেতনের অধিষ্ঠান

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতন্য থেকেই জীবনের সব প্রাকৃত সত্য গড়ে উঠবে জগতের সাপেক্ষে নিত্য বিকাশে। যেমন চেতন প্রজ্ঞা তেমনই হয়ে ওঠে জীবনের হয়ে ওঠা ভাস্বর। ঐ জীবন্ত ভাব সঞ্চার হয়েছে যখন নিত্য প্রকাশের এই পর্বে তেমনই হয়ে উঠবে গড়ে ওঠা। পূর্ণতার অভিমুখে চেতনার অভিযান হয়ে উঠবে জীবন মাঝে ভাস্বর তারই এখন নিত্য দিনের প্রকাশ রূপ। এমনই চেতন বিকাশ পর্ব মানবের গড়ে ওঠার এক অনিবার্য বরণ ও অবলম্বনের। মহাচৈতন্যের চেতন প্রসাদ হয়েছে জীবন মাঝে ভাস্বর যতই জীবনের বিকাশ হবে তেমনই যে ভাবধারা করে অবলম্বন জীবন প্রবাহ হবে বিশেষ এই ভাব বিন্যাসের এই পর্ব মাঝে মৌল চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। জীবন যেমন করেছে সঞ্চয় এগিয়ে চলবার পর্বে পর্বে সংস্কার হয়ে উঠবে একান্ত নিবেদন। এমন করে হয়েছে জীবন মাঝে হয়েছে নিত্য দিনের এই একান্ত নিবেদন পর্বের মাঝে এই বিশেষ বিস্তৃতি। জীবন প্রবাহ হয়ে চলে নিত্য দিনের গড়ে ওঠার মধ্যে হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত অভিমুখে এগিয়ে চলতে পথপ্রবাহে চৈতন্য যদি হয় ভগবৎ অভিমুখি তবেই একমাত্র এই জীবন প্রবাহ ভগবৎ ভাবনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে জীবনের নিত্য প্রত্যয়। জীবন প্রবাহ সর্বদাই চেতন প্রবাহকেই বরণ করেই চলে এগয়ে নিত্য বিকাশের গভীর অভ্যন্তরে। মন ও চেতন নিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে চলে তবেই হয়ে উঠবে জাগরণ নবীন চেতনের জগৎময় বিস্তার।

In the begining there were no reasons, there were only causes. Nathing had a purpose, nothing had so much as a function, there was no teleology in the world at all. There were nothing that had interests. But after millennia there happened to emerge simple replicators. Which they had no inkling of their interests, and perhaps properly speaking had no interests, we, peering back from our godlike vantage points at their early days, can non arbitrarily assign them certain interests-generated by their defining interest in self replication. That is may be it really made no difference, was a matter of no concern, didnot matter to anyone or anything whether or not they succeeded in replicating, but at least we can assign them interests conditionally. If there simple replicators are to survive and replicate thus persisting in the face of increasing entropy, their environment must meet certain conditions : conditions conducive to replications must be present or at least frequent.

(Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Back Bay Books, New York, 1991, p. 173.)

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চেতনাকে বুঝতে গিয়ে মানুষের শরীরের নানা উপাদানের উপর নির্ভর করেই পরীক্ষা নিরীক্ষাদি হয়ে চলেছে। বিশ্বমাঝে জড় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অচেতন আর চেতন নিরূপণ করা হয়। প্রাণ যতসময়ে শরীরে বিরাজ করে জড়চেতন শরীর মাঝে ক্রিয়া করে। জড় চেতনের মাত্রা নিরূপণ করতে হয় ঐ জড় বস্তু বা জড় অবস্থার অভ্যন্তরে কোন স্পন্দন রয়েছে কিনা সেই বিচারে মানুষের চেতনা জগৎ সাপেক্ষে জাগ্রত থাকাই জীবন। জীবনের রয়েছে নানা ভাবের নানা অবস্থার মত সব স্পন্দন। জীবনের এই স্পন্দন সর্বদাই হয়ে চলেছে সচল ক্রিয়াশীল। জীবনের ক্রিয়াশীলতা যতই মূর্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে ততই হবে তার জীবন মাঝে এগিয়ে চলার প্রাণের শক্তিগই জীবনকে সর্বদা ক্রিয়াশীল করে রাখতে পারে। প্রাণের শক্তি আহরণের যে সব বাহ্য পথ রয়েছে তার সবগুলিই হয়ে উঠবে ক্রমে নানা পরিচয়ের গতিপ্রবাহ। গতির নানা দিক রয়েছে যেমন রয়েছে জীবন মাঝে, অভ্যন্তরে স্থিত অবস্থাতেই আন্তর সঞ্চালন। আর বাইরের ক্ষেত্রে গিয়ে সেখানকার সাপেক্ষে গতিময় হয়ে থাকাই জীবনের জগৎ সঞ্চালন। আন্তর সঞ্চালনে অন্তরের জগৎ, আত্মার সাক্ষাৎকার, আর বাইরের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে কদম মিলিয়ে চলা।

বিজ্ঞানের বিজয় নানাভাবে সভ্যতাকে সেবা করে চলেছে। মানুষের জীবনে চাকচিক্য এসেছে, উন্নতি-স্বাচ্ছন্দ এসেছে, এমনকি জীবনের প্রতিদিনের পথচলার জন্য এসেছে অনেক উপকরণ আর উপাদান। এসবই ছাপিয়ে চলেছে এগিয়ে জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্রম প্রয়াস। আকাঙ্ক্ষা নানারূপে মনের ক্ষেত্রকে রয়েছে অধিকার করে। এই যাত্রার ফলে জীবনের ক্রমাগত এগিয়ে চলার যে দীপ্তি তারই সর্বত্র বিস্তৃত। সর্বত্র বিরাজমান এই প্রয়াসই জীবনের জন্য এক অপরূপ আবিষ্কার ও অধিকার নিয়ে হয়ে যাবে যুক্ত। প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার তাগিদে মানুষের এই জীবনের কাছে নিয়ে আসে কর্মচাঞ্চল্য কর্মের মধ্যে

গতি আসে নানা কারণে কখনও নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আবার কখন বা অন্যের সঙ্গে তুলনায় নিজের অবস্থান বিচার করেই কর্তব্য ও কর্মপ্রয়াস স্থির হয়। যে মন ভগবানে নিবেদিত তার কর্মচরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আদি সত্যের পরশে ঃ

মা নো হিংসী জ্ঞানিতা পরি অপস্যৎ।
যঃ পৃথিব্যা যঃ বঃ দিবং সত্যধর্মাঃ।
জজান যস্য অপশ্যৎ ইন্দ্র বৃহতী অর্জনান।
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (ঋ. বে. ১০/১২১/৯)

আদি দেবতা তুমি সকল সৃজনপথের আদি বীজ পিতা।
করেছ সৃষ্টি জগৎ সমূহ দিয়েছ ভরিয়ে প্রাণের প্রদীপে।
তোমারই পরম্পরায় আদি সত্যেরই মাঝে রয়েছে নিহিত।
যেমন করেই হয়েছে জগৎ চেতন জাগ্রত হয়ে যুক্ত।
পূর্ণ প্রজ্ঞার স্পর্শ করেছ সঞ্চার জগতের সবই ক্ষেত্রে।
এখন দাও ভরিয়ে জগৎ মাঝে তোমারই নিত্য মাধুর্য সত্য।
নিত্য প্রবাহ হোক জগৎ মাঝে ব্যাপ্ত সদা বিকাশ তরে।
মনের সীমার অতীতে এসেছে অনুভবের মূর্ত প্রাচুর্য।

মাতৃরূপের ধারায় ঃ

প্রজাপতে ন ত্বৎ এতানি অন্যয়োঃ।
বিশ্বা জাতানি পরি ত্বা বভুবঃ।
যৎ কাম অস্তেঃ জুহুমঃ তৎ অস্তুঃ।
বয়ং স্যাম এতৎ পতয়ৈঃ রথীনাম।। (ঋ. বে. ১০/১২১/১০)

আদি সৃষ্টির বলয় ছিল পরিপূর্ণ দিব্য সত্যের আয়োজনে।
আদি দেবতার সময় সূচনায় হয়েছে দিব্য মাধুর্যে পূর্ণ।
শিব স্পর্শে হয়েছে সৃষ্টির প্রসার হয়েছে ছন্দের আহ্বানে।
এখন শিব স্মরণের জাগরণ এই নিত্য প্রভায় হয়ে ভাস্বর।
তোমায় যদি খুব আপনত্বের বেষ্টনী হোক দৃপ্ত চেতন সম্পৃক্ত।
যা কিছু ছিল জগতের চাওয়ার মাঝে উঠেছে নিত্য প্রভাময়।
এখন ভক্ত প্রাণের প্রদীপ করেছ শিখাময় বিপুল এ প্রকাশে
এসেছে মাতৃরূপের এই ধারা হয়েছে এখন জগৎময় ব্যাপ্ত।

জাগরণের পথে সৃষ্টির রহস্য ঃ

তৎ এষা অভ্যনঃ উক্তা বিধায় লোকান বিধায়ঃ।
ভূতানি বিধায় সর্বৈঃ প্রদিশঃ বিশ্বশ্চঃ।
প্রজাপতিঃ প্রথমস্য ঋতস্যঃ।
আত্মনঃ আত্মানা অভিসংবিধেসঃ।
ইতি সর্বম্ বেদম আত্মবা।
তৎ এতৎ এব অনু প্রবিশতি। যঃ এবং বেদঃ।। (ঋ. বে. ১০/১২১/১১)

যা কিছু ছিল জীবনের মাঝে ভাগবতী দান সৃষ্টি সঞ্চারী।
এখন হোক তার ক্রম বিকাশ কালের এগিয়ে চলার পর্বে।
আত্মার জাগরণ এখন হবে বিশেষ প্রণিধান প্রকাশ সমূহে।
এখন ভাগবতী বিকাশ জীবনের দ্বার করবে সদা উন্মোচন।
জাগরণের প্রেরণা এসেছে এখন করতে উন্মোচন সদা প্রসন্নতায়।
সৃষ্টির এগিয়ে চলার ছন্দে হোক আত্মার ক্রম জাগরণ সদাই।
এখন সৃষ্টির বলয় হয়েছে পূর্ণ নিত্য বিকাশের দিব্য মাধুর্যে।
তোমায় করেছি আহ্বান মলয় পবনে সৃষ্টির নিত্য বিকাশ পথে।।

দিব্য কর্মপথে দিব্য অগ্নি ঃ বসুং ন চিত্রম হংস শৃনোষে।
বামং শেবম অতিথিম অদ্রিষ্যেন্যম।
সং রাসতে শুরুধৌ বিশ্বর্ধায়সৌ
অগ্নিহোতা গৃহপতিঃ সুবীর্যম্।। (১০/১২২/১)
দিব্য অগ্নি করেছে উন্মোচন জগৎ কর্মের সহযোগে।
অনন্ত ভাবপ্রকাশ এসেছে জীবনের এই জাগরণ স্রোতে।
অগ্নির দীপ্তি দিয়েছে কর্মের শক্তি জীবন মাঝে হয়ে ব্যাপ্ত।
এখন দিব্য জীবন পথের অভিযান হয়েছে প্রকাশ জগৎ কর্ম।
দিব্য কর্মের এই সাধন স্রোত হয়েছে বেগবতী কৃপার মাধুর্যে।
এখন ঐ সাধন পথের প্রত্যক্ষ আহ্বান দিব্য চেতনের উন্মোচনে।
সাধন মার্গে হয়েছে যুক্ত যত প্রাণচেতন হয়েছে সব উন্মুক্ত।
আলোর বর্ষণ এসেছে এখন প্রাণের গভীরে করতে দর্শন পূর্ণ সনাতনে।

ভগবানকে যে গ্রহণ ও বরণ করেছে জীবনে যে মন তার সমগ্র বিষয় স্বতন্ত্র। এই মন শয়নে-জাগরণে-স্বপনে সব সময়েই পারে ভগবানকে মননে রাখতে। জীবন কর্ম সবার জন্য একরকম নয়। যত মানুষ ততগুলি কর্মপ্রকরণ। সবারই কর্ম প্রয়াস রয়েছে। জীবন ধারণের জন্য কর্ম-প্রয়াস ও প্রকৃত কর্ম আবশ্যিক। যে মানুষ যেমন করে ঐ কর্মের পথে এগিয়ে যেতে পারে পর্বে পর্বে তারই এমন করে হয়ে চলে এমন করে এসে যায় জীবন পথের বাস্তবতা। মনের মাঝে যখন ফুটে উঠবে জীবনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলবার আহ্বান তখনই খুঁজে নেবে জীবন মাঝে যে অঙ্গীকার থাকে। ভগবানের পথে এগিয়ে চলেছে যে জীবন তার ভাগবতী যোগ প্রতিদিনের। প্রাণবায়ু এ জীবনের মাঝে বয়ে নিয়ে আসে জগতের মাঝে ভাগবতী বার্তা। ভাগবতী কর্তাকে জীবন মাঝে বরণ করে নিয়েই ভক্ত বা সাধক জীবনের যাত্রাপথে এগিয়ে চলা হয়ে থাকে। কর্মচিন্তা এখানে কখনই ভাগবতী চিন্তার অন্তরায় হয়ে যায় না। কর্মচিন্তা ভাগবতী চিন্তাকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলে কর্মের পথে ধরে জীবন যাত্রায়। এই জীবনযাত্রা পথকে শক্তিময়-মনোময় করে নিয়েই জগতের জীবন যজ্ঞ হয়ে চলেছে। জীবনের এই যজ্ঞপর্ব অনন্য সাধন।

'Cartesean materialism, the view that nobody espouses but almost everybody tends to think in terms of, suggests the following subterranean picture. We know that information moves around in the brain, getting processed by various mechanisms in various regions. Our intuitions suggest that our streams of consciousness consist of events occurring in sequence, and that at any instant every element in that sequence can be classified as either having already occurred 'in consciousness' or as having not occurred there yet. And if that is so, then (it seems) the contentful vehicles of contant moving through the brain must be like railroad cars on a track; the order in which they pass by some paint will be the order in which they, 'arrive at' the theater of consciousness and (hence) 'become conscious', So determine where in the brain consciousness happens, trace all the trajectories of information-vehicles, and see what point particular vehicles are passing at the instant they become conscious.'
(Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Back Bay Books, New York, 1991, p. 144.)

চিরায়ত অধ্যাত্ম পথের মাঝে ফুটে রয়েছে যে ভাবনা সেখানে ভগবান হয়ে গিয়েছেন জীবনের যাপন পথ থেকে স্বতন্ত্র। জীবনের এই যাপন পথ সবসময়েই হয়ে ওঠে নিত্য ভাব প্রয়াসের দ্বারা সমৃদ্ধ। বাইরের উপকরণ সবই জীবনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। আবার অন্তর মাঝে বিরাজমান যে জগৎ তার তাৎপর্যকে যথাযথ অনুধাবন না করে হয়ে উঠেছে জীবনের নবীন পরিচয় রচনা। এই নবীন পরিচয় গড়ে ওঠে প্রতিদিনের কর্মের পথ ধরেই। কর্মচিন্তা আর কর্ম যেন একই অবয়বের দু'টি অবস্থার পরিচয়। জগৎ কর্ম মনকে আবেষ্টন করে রাখতে চায়, পারেও। জগৎ কর্মের মাঝে রয়েছে জীবনের সব দিকই। শিশুর বেড়ে ওঠার প্রয়াসের সবটাই হয়ে ওঠে মোটামুটিভাবে যেমনটি হয়েছে চারদিক থেকে এগিয়ে আসা, প্রভাব বিস্তার থাকা সব প্রাণ-মন-হৃদয় হয়ে উঠবে জগতের মত করেই। পরিবেশ, আশপাশের প্রভাব আবার হয়ে উঠতে পারে; অনন্ত আকাশ আর অনির্বচনীয় কোনও ভাবপ্রসাদ হয়ে প্রকাশ হয়ে উঠতে পারে ঐ শিশুর বিকাশ পথ। জীবনের বেড়ে ওঠার পর্বে আধুনিক সমাজ এগিয়ে দিয়েছে

অনন্ত সব প্রতিযোগিতার উপাদান। এমন প্রতিযোগিতা যা ভুলিয়ে দিতে সক্ষম জীবনের মধ্যে ভাগবতী বিকাশের সব সম্ভাবনা। এমন করে সম্ভাবনাদির জীবন বীজ নিভে যেতে পারে, হারিয়ে ফেলতে পারে জীবনের বেড়ে ওঠা ও জীবনযাপনের আত্যন্তিক উদ্দেশ্য। মনের আনুকুল্য আর প্রাণের সহযোগ প্রায় সব সময়েই হয়ে উঠেছে একান্তভাব এই জীবনের জন্য নিবেদিত।

ভগবানকে যদি শ্রবণে-মননে-ধ্যানে-প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কোনওভাবে বরণ করে নিয়েছে জীবন তবে তার জীবন কর্ম, জগৎ কর্ম আর ব্যক্তিগত বিষয়াদি সবই হয়ে যায় পূর্ণ স্বাতন্ত্রে বিধৃত। এই স্বাতন্ত্রটি তার কর্মপথের সবটুকুকে একত্রিত করে এমন ভাবেই হয়ে উঠে যেতে পারে। এমন করেই হয়ে উঠেছে আবার অন্য একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন। এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের জন্য চাই ভক্তির শক্তি অথবা জ্ঞানের দ্বার ভক্তি ও জ্ঞান যখন মেশামিশি হয়ে যায় তখন আসে অনন্যতায়। এমন করেই জীবনের জন্য এক নবীন ছন্দ হয়ে যায় প্রস্তুত। এই ছন্দটি জীবনের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচক। এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন স্বতঃই জীবনের প্রয়াসজাত।

দৈবী চেতনের জীবন বিকাশ ঃ

জুষানো অগ্নেঃ প্রতি হয়ং মে বচৌ।
বিশ্বানি বিদ্যান বয়ুনানি।
সুক্রতু ঘৃতনির্নিক ব্রহ্মণ গাতুমেরয়।
তব দেবা অকনয়ন অনু ব্রতম্।। (ঋ. বে. ১০/১২২/২)

তোমায় করি আবাহন এই সুমধুর মন্ত্রপথে।
এই বাকের সাধনে হয়েছে জীবন সমৃদ্ধ তোমার সত্যে।
এই বাক সাধনে হয়েছে জীবন মাঝে স্বতন্ত্র বিকাশ।
সাধন যজ্ঞে পেয়েছি তোমারই ভাবস্পর্শ চেতন বিকাশে।
এখনই হয়েছে যত বিকাশ ব্যাপ্তি হবে তারই স্ফূর্তি জীবনে।
আলোর প্রবাহ দিয়েছ তুমি প্রজ্ঞার সঞ্চারে এই জীবন মাঝে।
দেবতার ভাব বিকাশ হোক এখন চেতনার নিত্য জাগরণে।
দেব ভাবনার ক্রম বিকাশ হয়ে উঠুক জীবনের অনন্ত উপলব্ধি।

পথের নবীন পরিচয়ে সত্যচয়ন ঃ

সন্ত ধামানি পরিয়মম মর্তোঃ।
দাশৎ দাশুষে সুকৃতে মামহস্ব।
সুবীরেণ রয়িন অগ্নে সু অভূবা
যঃ তঃ আনট সমিষা তং জুষস্ব।। (ঋ. বে. ১০/১২২/৩)

কর্মপথে যে প্রাণ দিয়েছে আহুতি দেবতায় হয়েছে তার
সত্যের উপলব্ধি জীবনের পথচলার এই প্রয়াস পর্বে।
পেয়েছে সে প্রাণ সত্যের শক্তি নবীন উপলব্ধির এই পর্বের মাঝে
অগ্নি ব্রতে হয়েছে জীবন সাধনের নিশ্চিত উন্মেষ।
এখন এসেছে ভগবৎ শক্তির দীপ্তি পরম একান্তে জীবন মাঝে।
হোক তারই উন্মেষ নিত্য পথের নিত্য আহরণের মাঝে।
দেবতার কৃপার শাশ্বত ভাবপ্রদীপ এসেছে জাগরণ মন্ত্রে।
জীবনময় হয়েছে যজ্ঞের সূচনায় দৈবী আবাহনের সত্যচয়নে।

অন্তর মাঝে হয়েছে সাধন প্রজ্ঞার সঞ্চার ঃ

যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতং।
হবিষ্মন্ত ইলতে সপ্ত বাজিনাম।
শৃণ্বন্ তম্ অগ্নিম্ ঘৃত পৃষ্টম্ ক্ষণম্।
শৃণন্তং দেবং পৃণতে সুবীর্যম্।। (ঋ. বে. ১০/১২২/৪)

অনন্ত তোমার সৃষ্টির মাঝে অনন্ত তোমার বিকাশ।
ঐ ভাবপ্রভার কিরণ এসেছে জীবন মাঝে তোমারি আহ্বানে।

ঐ পর্বত শিখরে রয়েছে তোমার বিস্তৃতির সব পর্বকথা।
এই জগৎ মাঝে তোমারই হয়েছে ভাবপ্রকাশ সবার কাছে।
এখন ঐ অনন্ত বিকাশের নবীন অবস্থান সাধক অন্তর মাঝে।
অন্তর মাঝে জেগেছে আগ্রহ হবে তার উন্মোচনের সূচনা।
দেবতার আশীষ এসেছে সর্বদাই জীবন প্রকাশ মাধুর্য্যের চয়নে।
এখনই হয়েছে নিবেদন তরে অন্তরের কঠিন জাগরণে।।

সাধন পথের গূঢ় নিবেদনে ঃ

ত্বং দুতঃ প্রথমং বরেণ্যং।
সঃ হূয়মানো অমৃতায় মর্তঃ সঃ এব।
ত্বাং মর্জয়ন মরুতঃ দাশঃ অয়ং মরুত দাশং।
গৃহে ত্বাং স্তেমন অভিভর্গবঃ বি ররুঃ চঃ।। (ঋ. বে. ১০/১২২/৫)

দিয়েছ তুমি সদাই গতির দৃপ্ত বিকাশ জগৎ উন্মোচনে।
জগতে এখন হোক ভাবস্পৃষ্ট মাঝে অনন্ত বিকাশ মাধুর্যে।
যা কিছু ভাবনার পরিপূর্ণতায় এসেছে জীবন যজ্ঞের পথে
দিয়েছ সাধন শক্তি করতে বিজয় সব জড়তা বন্ধন।
ঐ বিকাশ পর্বে দিয়েছ প্রাণের শক্তি প্রেরণার দীপ্তি।
ঋষির নিয়মের এই অনন্য বিস্তার সাধন চেতনের বিপুল শক্তি।
তোমায় করে জগৎ পথে করে বরণ সেই বিকাশ পর্ব মাঝে।
ঋষির দৃষ্টি হোক ভরপুর পূর্ণতার আগ্রহ নিবেদনে।।

ভাগবতী কর্ম সেটিই যেটি ভগবানকে নিবেদিত। কর্মাদির সবই বিশিষ্টতায় পূর্ণ। বিশিষ্টতার তাৎপর্য হল সেই কর্ম যা করার পিছনে নিজের স্থানপূর্ণ দৃষ্টি বাজিত। নিজের স্বার্থপূর্ণ কর্ম ব্যতিরেকে অন্য কর্মের জগতে প্রবেশে করতে হলে বুঝে নিতে হবে যে কর্মের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবেই হয়ে উঠবে স্বতঃই সফল। প্রতিটি কর্মের মধ্যে তার পরিণতির লক্ষ্য রয়েছে। কর্মের মাঝে এই অভীষ্ট কর্মকেই রূপদান করে। কর্মের এই রূপ গ্রহণই সফলতার জন্য প্রয়াস করা। জগৎ কর্ম স্বতঃই হয়ে রয়েছে সাফল্যের অভিলাষী। সাফল্য তখনই আসে যখন হয় কর্মের নির্দিষ্ট এক পরিমণ্ডল। এই সব পরিমণ্ডল প্রায়শঃই কর্মকে নিজ স্বার্থ পূরণের পথের অভিমুখে ঠেলে দেয়। স্বার্থ পূরণ করবার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এমন করে কেমনে হবে কর্ম সেটি খুঁজে পাওয়া হয়ে ওঠে না। স্বতঃই কর্মপথের যোজনায় হয়ে উঠতে পারে কোনও অভিমুখ বিহিন কর্ম, উদ্দেশ্য বিরহিত কর্ম। এমন কর্ম এনে দেয় অভিজ্ঞতার কোন প্রকার সংবেদ। অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ক্রমাগতভাবে কর্মাদি তার সাফল্যের জন্যই প্রয়াসী হয়ে ওঠে। সাফল্যই কর্মের পরিণতি এমনই বর্তমান বোধ।

According to the multiple drafts model, all varieties of perception indeed, all varieties of thought or mental activity – are accomplished in the brain by parallel, multitrack processes of interpretation and elaboration of sensory inputs. Information entering the nervous system is under continuous ‘editorial revision’. For instance, since your head moves a bit and your eyes move a lot, the images on your retinas swim about constantly, rather live the images of home movies taken by people who can’t keep the camera from jiggling. But that is not how it seems to us. People are often surprised to learn that under normal conditions, their eyes dart about in rapid saccades, about five quick fixations a second, and that is motions, live the motion of their heads, is edited out early in the processing from eyeball to consciousness. Psychologists have learned a lot about the mechanisms for achieving these normal effects, and have also discovered some special effects, such as the interpretation of depth in random dot stereograms. (Daniel C. Dennett, consciousness Explained, Back Bay Books, New York, 1991, p. 111.)

নিষ্কাম কর্মই ভাগবতী কর্ম। যে কোন কর্মই সম্পাদন হোক না কেন, এটি হয়ে থাকে স্বাতন্ত্রে অথবা সমগ্রতায় এই মহাবিশ্বের একটি পরিষেবা। একটি প্রাণীর প্রাণ সঞ্চারের জন্য খাদ্য আহরণ ঐ প্রাণীর জন্য একান্ত আবশ্যক। একটি প্রাণ প্রাণ-সঞ্চার প্রয়াসের জন্য যে খাদ্য আহরণ করে চলেছে সেটি এই মহাবিশ্বের সামগ্রিক পরিষেবা। প্রাণের সীমায়িত সময় পর্যন্ত তার জীবন সঞ্চালনের

জন্য অত্যাবশ্যিক হল খাদ্যাদি সকলকে খাদ্য সংস্থান করতে হয় অথবা পেতে হয়। খাদ্যের সংস্থানের জন্য সর্বদাই কর্ম ও উদ্যোগ প্রয়োজন হয়। কর্ম ও উদ্যোগের মধ্য দিয়েই জীবনের সংস্থান হয় সব কিছু জীবনের যা কিছু উদ্যোগ ও যা কিছু সহযোগ সবেরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসে আর ফুটে ওঠে সঞ্চালনের সব পথগুলি। নিষ্কাম কর্ম অথবা কামনা যুক্ত কর্ম উভয়ই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য নিষ্কাম কর্মপথে ভগবানে সমর্পণ হয়ে উঠে যদি বা তবে সে কর্মের চরিত্র ও গতিপথ হুয়ে ওঠে অনির্বচনীয় ও একান্ত বিশেষ ভাবযুক্ত কোনও প্রয়াস। কর্ম প্রয়াস সবই জগৎ মাঝে হয়ে উঠতে পারে বহুদূর ব্যাপ্ত ও বহু দূর আশ্রয়ী জীবনের স্থায়ী মহাযোগী হয়ে। নিষ্কাম কর্মী পরিপূর্ণ মনোযোগ, অর্থাৎ পুরো মনটি দিয়ে কর্ম সম্পাদন করতে পারে। কামনা-বাসনা পূর্ণ মনের মাঝে ফুটে উঠে প্রাপ্তব্যের ভাবনা কর্মটির সম্পাদন করে কি লাভ হবে অথবা কি পাওয়া যাবে এর ফলে এসব ভাবনা। প্রাপ্তব্যের ভাবনাকে কেন্দ্র রেখেই মনের যোজনা হয় কর্মপথে। কর্ম সাধারণত সম্পাদন হয় মনের একাংশের দ্বারা কর্মচিন্তা-কর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জগৎকর্ম এগিয়ে চলে। অনেক আশা, অনেক বাসনা মানুষের জীবনের পর্বে পর্বে জমতে থাকে। কিছু আশার পূরণ হয়; কখনও বা সব আশার পূরণ হতে পারে। আশার যদি আংশিক পূরণ হয় তবে বাকীটা অন্য রং ও রূপে আবার নতুন ধরনের বাসনা হয়ে ফটে ওঠে। এসব বাসনা আর অপূর্ণ আশা এখন দলবদ্ধ হয়ে যায়। এরা এখন একটি সমন্বিত শক্তি হয়ে মনের গভীরে আনে হতাশা, অবসাদ, অবসন্নতা, নানা বিষয়ে অন্ধকারে ভরে যায় মন। অন্ধকার আর না পারার মনোভাব পেয়ে বসে। হতাশা-অবসাদের গ্রাসে আবছন্ন মন পরাজিত, বিপন্ন হয়ে যায়। মনের শক্তি উবে যায়। প্রাণের শক্তি মেষ নি। শেষ হয়ে যায়। মানুষটির অন্তরের শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। জীবনের সব সংগ্রামে সে পিছু হটে যায়। বিশ্বাস হারা হয়ে এমন অবস্থায় মানুষটির মধ্যে চিত্তের প্রেরণা প্রসাদ অস্তমিত হয়ে যায়। জীবনের পথে এক সময়ে সে হয়ে যায় পথহারা অবসন্ন এক অনির্দেশের অভিমুখি পথিক। মনের শক্তি হারিয়ে সে শরীরের মধ্যে ডেকে নিয়ে আসে নানা রোগের প্রভাব। হয়ে যায় এই মানুষটি রুগ্ন-অসুস্থ-অপারগ, কখনও বা এক জড় প্রাণ। এমন জড় প্রাণ যার মধ্যে প্রাণের গতি হয়ে যায় শেষ অবস্থার, প্রাণের গতি শক্তি আর স্থিত শক্তি সবেরই অস্তগামী এক অবস্থার সূচনা হয়ে যায়। এমন মন-প্রাণ-জীবন জগতের পথে গতিহীন স্থবির প্রাণ হয়ে যায়। এমনকি সুস্থ চিন্তার শক্তি হারিয়ে যায় এই প্রাণ। সুস্থ চিন্তার অন্তে প্রাণটি অন্যের দ্বারা শুভাশুভ বিচারবোধ লুপ্ত অবস্থার মধ্যে দিশাহারা এই প্রাণ এখন জগৎ মাঝে নিজের মানবিক মূল্যবোধ লুপ্ত হয়ে জগৎ মাঝে যে কোন মাত্রার অন্যায়কার্যে ব্রতী হতে পারবে। বিশ্ব মাঝে প্রাণের এই অবস্থা জগতে ব্যাপ্ত প্রাণশক্তির এক বিপর্যয়কারী অবস্থা।

তোমারই সত্যের পরশে ঃ ঈশন্ দুহন্ সুদুখাং বিশ্বধায়সং।
যজ্ঞ প্রিয়ে যজমানায় সক্রতেব।
অগ্নে ঘৃতস্ন ঋতানি দীদ্যৎ।
বর্তি যজ্ঞং পরিয়ন সুক্রতুয়মে।। (ঋ. বে. ১০/১২২/৬)
ভাগবতী ইচ্ছা হয়েছে শিখাময় মানব ইচ্ছায়।
ঐ দিব্য ভাব স্রোত এখন হয়েছে প্রবাহিত অন্তরের গভীরে।
তোমারই অনুভব করেছে জীবনে প্রজ্ঞার সঞ্চার যেন স্বতঃই।
এমনই দৃপ্ত অনন্ত ভাবপথের গভীরে একান্ত বরণে।
যে ভাবদীপ্তি করেছে বরণ সাধন জীবন একান্ত আগ্রহে
দাও তার প্রাণ প্রদীপ করে শিখাময় অনন্ত জীবন পথে।
সাধন অগ্নির এখন পূর্ণ প্রকাশ ক্ষণ অন্তর নিবেদনে।
তোমায় সন্ধানে পেচেছি তোমারি সত্যের পরশ জীবনে।

ব্রহ্মপ্রজ্ঞার জগৎ বিস্তারে ঃ ত্বমঃ অদস্যা উষসৌ ব্যুষ্টি অসুঃ।
দূতং কন্বানা অযজন ব্যাবৃধুঃ।
তাং দেবা মহয়া অস্যায় ব্যাবৃধুঃ
আজন্ম অগ্নে নিঃ সৃজন্তো অধ্বরে। (ঋ. বে. ১০/১২২/৭)
হয়েছি তোমারি বার্তার জীবন অনুসারী এই বেদপথে।

যেমন করে এসেছে সত্যের উপহার জগৎ মাঝে এ পর্যন্ত।
দিয়েছ বার্তা করতে চয়ন নবীন সত্য ঐ পরম সত্য প্রকাশে।
এখন অনন্ত সত্যময় এই জগৎ সত্য করবে বরণ তোমায়।
যে ভাবদীপ্তি পেয়েছে আশ্রয় এই চেতন পথে হয়েছে তার প্রকাশ
এমন ভাবপ্রকাশই হয়েছে মানবের উপহার দেবতায় বরণে।
আলোর মালায় দিয়েছ ভরিয়ে তোমারই ভাবপ্রকাশ জগতে।
এখন ঐ আলোয় হয়ে স্নাত হবে প্রজ্ঞার বিস্তার জগতময়।।

ব্রহ্মানন্দ চেতন প্রকাশে ঃ

নি ত্বা বশিষ্টা অহবন্ত।
বাজিনং গৃনন্তো অগ্নে। বিদথেষু বেধসঃ।
রায়স্পোষং যজমানেষু ধারয়।
যুয়ং পাত স্বস্তিঃ এভিঃ সদা নঃ।। (ঋ. বে. ১০/১২২/৮)

বশিষ্টের প্রেরণায় হয়েছি বাকদীপ্ত এই সাধন পথে।
অনন্তের পথ দিশা পেয়েছি এখন এই জীবন চলায়।
ব্রহ্ম সত্য হয়েছেন স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় রূপ সঞ্চারে।
এখন একটু একটু সত্যের কণা হয়ে চলেছে যুক্ত ঐ অসীমে।
নিত্যই হয়ে চলেছে নবীন প্রকাশ অনন্ত ভাবদীপ্তির প্রভায়
তোমার আলোক দীপ্তি দিয়েছে এগিয়ে তোমারই ব্রহ্মপরশ জীবনে।
এখন প্রজ্ঞার উন্মোচন পর্বের স্তরে স্তরে হয়েছে বিন্যস্ত আনন্দ।
তোমার চেতন স্পর্শে জগৎ মাঝেই হয়েছে প্রকট ব্রহ্মানন্দ।

জগৎ মাঝে আনন্দময় চেতন তনু ঃ

অয়ং বেন শ্রোদয়তঃ পযক্ষি গর্ভাঃ।
জ্যোতিঃ প্রকাশং জীবনম সৃজাৎ রজস মার্গং বায়ুম।
ইমং অপং সংগ্রামম নবীনম প্রকাশং।
ন বিপ্রা মতির্ভিঃ রিহন্তি। (ঋ. বে. ১০/১২২/৯)

অনন্তের জগৎ দীপ্তি প্রকৃতির মাতৃরূপের প্রকাশে।
হয়েছে ভরপুর সব জীবনময় হয়ে সত্যদীপ্ত মালার প্রকরণ।
যে ভাবপ্রকাশ হয়েছে এখন জীবনের সনাতনি পথে।
এখন তার জগৎময় ব্যাপ্তি অনন্তের ক্ষণ প্রকাশ দীপ্তিতে।
ঐ বার্তা এসেছে ঋষির প্রত্যয় ঘন এই জগৎ অবয়ব মাঝে।
যে করবে বরণ তার এই দূত প্রকাশ হবে আনন্দে ভরপুর।
এই ভাবপথ এখন অনন্য ভাবমার্গের একান্ত দ্যোতনায়
ব্রহ্মচেতন এখন জীবনের অনন্যতায় হয়েছে ভাস্বর প্রকাশ পর্বে।

ভগবৎ সত্যের পরশ মন-প্রাণ-হৃদয়কে জগতের কাছে তুলে ধরে একান্ত বিকাশপথে। হয়ে উঠতে ভাগবতী মহিমায় ভরপুর। এমন করেই তার জীবন বৃক্ষে আবার নতুন করে ফুল ফুটতে পারে। নতুন ভাবে হতে পারে বিকশিত। এই বিকাশ অন্তরের রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। অনন্যতায় ভাস্বর হয়ে থাকা এই বিকাশ স্বতঃই হয়ে যায় জীবন বিকাশী। মানবিক জৈববোধ যে সাব চাওয়া পাওয়াকে সর্বদা মূল্য দেয়— শরীরের সবরকম চাওয়া, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তী এসবই হয়ে উঠবে তখন অনন্যতায় ভরপুর। ভগবানকে অন্তরে বরণ করতে পেরে মানুষটির মধ্যে বিশ্বাস গড়ে ওঠ দৃঢ়ভাবে অন্তরের বিশুদ্ধতায় ভগবৎ পরশ ক্রমশঃ আবিষ্ট করে দেবে অভ্যন্তর। এমন করে এই আবেষ্টন হয়ে উঠবে যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে নতুন ধরনের অভীপ্সা। নতুন বিশ্বাস, নতুন আগ্রহ, নতুন চাওয়া এক নতুন মানুষকেই জগতের মাঝে এখন পেশ করবে। এই নতুন মানুষটির জীবন এখন সত্যের পথে, সত্যের পর্বে এগিয়ে চলবে। জাগতিক সত্য হলে আপাত সত্য, আংশিক সত্য। ভগবান স্বয়ং পূর্ণ সত্য। ভগবান যখন

মানব রূপে অবতীর্ণ হন তখন তার বেশিরভাগ কর্মের ব্যাখ্যা মানবিক দৃষ্টিতে বোঝা যায় না। বুঝতে হলে নিজের মধ্যে, চাই ভাগবতী চর্যা, হবে দৈবীগুণ বিকাশ।

There is no single, definitive stream of consciousness, because there is no central Head quarters, no Cartesian Theatre where 'it all comes together' for the perusal of a central meaner. Instead of such a single stream (however wide), there are multiple channels in which specialist circuits try, in parallel pandemoniums, to do their various things, creating multiple drafts as they go. Most of there fragmentary drafts of narration play short lived roles in the modulation of current activity but some get promoted to further functional roles, in swift succession by the activity of a virtual machine in the brain. The seriality of this machine (its 'von neumannesque' character) is not a 'hard wired' design feature, but rather the upshot of a succession of coalitions of there specialists.

The basic specialists are part of our animal heritage. They were not developed to perform peculiarly human actions, such as reading and writing, but ducking, predator-avoiding, face-recognizing graspung, throwing, berry picking and other essential tasks.

(Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Back Bay Books, New York, P. 254.)

দৈবীগুণ ফুটে ওঠে ও জীবনের সহজাত হতে পারে যখন ভাগবতী বিশ্বাস অন্তরে দানা বাধে। ভাগবতী বিশ্বাস থেকেই জীবনের রূপান্তর সূচনা হয়ে যায়। ভাগবতী বিশ্বাস আর ভগবানে ভক্তি যেন ঘনিষ্ঠ সখা। একটির উপস্থিতি আরেকটিকে ডেকে নিয়ে আসে। যেমন করে জীবন মাঝে কখনও কোনও সুযোগে, কোনওভাবে এসে যায় ভাগবৎ ভাবনার, ভাগবতী ভাব বা ভাগবতী শ্রুতি, স্পর্শ, মনন, দর্শন, অনুভব সবই এসে যায়। এমন মনন ও ভাবনার মধ্যেই এসে যায় ভাগবতী উপলব্ধির স্রোত। এই স্রোত সদাই হয়ে যায় অনন্যতায় বিধৃত। এসব অনন্যতার সমন্বয় জীবন মাঝে ঘটে যায়, জীবনের মাঝে স্বাতন্ত্র বিধৃত এক ভক্ত ও তার ভগবানের মাঝে যে অন্বয় রয়েছে তার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সেতু। এটি বিশ্বাস-ভক্তির সেতু। এই বিশ্বাস ও ভক্তির সেতু জীবন মাঝে অনন্ত সম্ভাবনাকে নিয়ে আসে একান্ত প্রকাশে। এই একান্ত প্রকাশ ঐ ভক্ত সেতু জীবন মাঝে অনন্ত সম্ভাবনাকে নিয়ে আসে একান্ত প্রকাশে। এই একান্ত প্রকাশ ঐ ভক্ত তার জীবনকে যে রূপে, যে ভাবে ভগবানের কাছে পেশ করতে প্রয়াসী অথবা নিবেদনের জন্য আগ্রহী তারই হয়ে উঠবে নির্দিষ্ট পথের অভিযানে এগিয়ে চলা। এমন ভাবই মনের মাঝে নিয়ে আসবে দিব্য শক্তির ক্রম উন্মেষ। প্রাণের এখন মহাপ্রাণের সঙ্গে সংযোগ হয়ে উঠবে। মন প্রাণ হৃদয় সমন্বিত হয়ে ভগবৎ সেবার ও নিবেদনের পথে চলবে এগিয়ে। মিথ্যার পরশ ও প্রভাব যাবে ঘুচে, চলে যাবে অন্তর থেকে সব অন্ধকারের ছবি; না-পারার মনোভাব।

ভগবৎ বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভায় জাগ্রত হবে অন্তরের শক্তি। মানুষটির এখন মনে হবে নির্দিষ্ট মাত্রায় এগিয়ে চলতে ও ভাগবতী পথের পথিক হতে যে বিশুদ্ধতার শক্তি আর ভক্তির শক্তি হয়ে উঠবে নবীন বিকাশের মধ্যে ডুবে যাওয়া। এই নবীন ভাবনার মধ্যে হয়ে উঠবে জীবনের মধ্যে নিষিক্ত সব বিকাশ ভাবনা। এমন বিকাশ ভাবনা যার মধ্যে ভগবত্তার বীজ ভাস্বর। ভগবৎ ভাবনায় এসে যায় অবশ্য নির্দিষ্ট দৈবী গুণ সমূহ। এমন সব গুণ মাত্রা যার মধ্যে রয়েছে বিকাশের শক্তি, সৃষ্টির সম্ভাবনার শক্তি, লালন-পালনের শক্তি ও বিকাশের সামগ্রিক শক্তি। দৈবী গুণ জাগ্রত হলে মানুষের মধ্যে ফুটে উঠবে সত্য পথ ও সত্য পালনের জীবন মাঝে আগ্রহ। সত্য ও ঋত জীবনের আশ্রয় হয়ে জীবন মাঝে জেগে উঠবে সত্ত্বগুণ গুলি; ধৃতি-ক্ষমা-দম-অস্তেয়-ইন্দ্রিয় সংযম-মনের সংযম—সত্য-বিশ্বাস-ক্ষমা-দণ্ড- সারল্য-বহুজনের জন্য নিজের ত্যাগ—নিঃস্বার্থ সেবা; নিষ্কাম কর্ম ও ভগবানে নিবেদিত একটি প্রাণ।

শিব সাধন ঃ অথঃ যোগ অনুশাসনম্। (পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র, ১/১)

মনের বিচিত্র অবস্থার সাযুজ্যে ব্যাপ্তি অন্তর রাজ্যে
ভগবৎ ভাবের গভীরে করতে প্রবেশ মনেরই চরিত্র নিরুপণ সত্যধর্মে।
একান্ত ভাব পরিবেশনের এক নিবিড় অভিব্যক্তির পথ পরিচয়ের সূত্রে
মনের দৃপ্ত ভাবপ্রকাশ জীবনের উন্মুক্ত চেতন পথের নিত্য আবাহনের সুরে।

যোগঃ চিত্তঃ বৃত্তি নিরোধঃ।
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্। (প. যো. সূ. ১/২, ৩)

ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে মনের সাধারণ অবস্থার পরিচয় জগৎ মাঝে
বাসনার দীপ্তি করেছে অধিকার মনের গভীর চেতন উৎসের মাঝে।
মূঢ় মনের অজ্ঞানতার কালো মেঘের ছায়া করেছে একান্ত বিভাষিত জীবনে।
অজ্ঞানতার আবিলতার বেষ্টনী করেছে যদি অধিকার মনের চেতন পথ
হবে অভিযান করতে ছিন্ন ঐ অজ্ঞানতার আবেষ্টন হবে দূর একাগ্রতায়
মনের চেতন রথ এখন চলবে এগিয়ে জীবন পথের সদা প্রসারী আলোকে।
এখন সকল বৃত্তির অধিকার করে অতিক্রম একান্ত নিবেদনের এই ক্ষণপর্বে
নিরুদ্ধ মনের অচঞ্চল জ্যোতির্ময় আলোক প্রভায় হবে দর্শন পূর্ণ চেতনপ্রভায়।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতব্য ক্লিষ্টঃ অক্লিষ্টঃ। (প. যো. সূ. ১/৫)

জীবের জীবন যাত্রার পথে এসেছে যত ক্লেশ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে
হয়েছে সে সব জীবনের ভাগবতী অভিযানের অভিমুখে বিশেষ অন্তরায়
অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ সহ সব ক্লেশ অবস্থায়
হয়েছে জীবের ভাগবতী পথের অভিযান নানা বাধার লাঞ্ছনা।
এখন এসেছে জীবন মাঝে যত কিছু অন্তরায় মনের বিকাশ পর্বে
ক্লেশ মোচনের পর্ব পথে তারই নিত্য উত্তরণ পর্ব হবে নিশ্চিত।

প্রত্যক্ষঃ অনুমান-আগম-প্রমানানি (প. যো. সূ. ১/৯)

অভ্যাসঃ-বৈরাগ্যাভ্যাং তৎ নিরোধঃ। (প. যো. সূ. ১/১২)

যা কিছু হয়েছে অন্তরায় জীবনের ভাগবতী অভিযান পর্বে
হয়েছে যদি তার স্থির নিরূপণ জীবন মাঝে হয়ে নিশ্চিত
দৃঢ় অচঞ্চল ঐ ভাব দীপ্তি এখন হবে জীবনের স্থির প্রত্যয় প্রভা
যে বিকাশ পর্ব এসেছে সাধন পথে করে বরণ তায় চলবে এগিয়ে জীবন।
সত্যলাভ হয়ে উঠবে উপলব্ধির পথের প্রত্যক্ষ দর্শনে শাস্ত্র বিহিত পথে।
বিশ্বাস পথের এই তীব্র ব্যাকুলতায় হবে নিত্য দিনের সাধন অর্জন।

ভাগবতী যোগ ঃ

তত্রঃ স্থিতঃ যত্নঃ অভ্যাস্যাৎ। (প. যো. সূ. ১/১৩)

সঃ তু দীর্ঘকালঃ নৈরন্তর্য সৎকার আসেবিতঃ দৃঢ়ভূমিঃ। (প. ১/১৪)

অভ্যাসের উদ্যোগ দেয় জীবন মাঝে বৃত্তির সমাহার একত্র হয়ে একস্থানে।
যেমন করে হয়ে উঠবে জীবন মাঝে বিন্যাস ঐ অনন্ত প্রবাহী ভাব সংস্থানে।
হয়েছে তারই নিশ্চয় প্রত্যয় জীবন মাঝে ব্যবহারিক সত্যের সীমা করে পার।
যত্নসহ অভ্যাসের পথে গড়ে ওঠে ভাগবতী বিশ্বাস ক্রম নির্দিষ্ট ভাবে।
যেমনই হয়ে উঠবে এই ভাব প্রত্যয় জীবন পথের অভীপ্সায় উঠবে তেমন ভাব।
প্রত্যয়ের নিরীখ হবে মনের একান্ত স্থির নির্দিষ্ট ভাব মাত্রার অভ্যন্তরে।
এমনই প্রস্তুতির পথে দীর্ঘ প্রয়আসের মাত্রায় প্রয়োজন সমগ্রতায় বরণ।
দৃঢ় অচঞ্চল মনোভূমির এই নিরীখ এখন এনে দেবে অনন্ত বিকাশ প্রসঙ্গ।

বিতর্ক-বিচার-আনন্দ-অস্মিতা-রূপ অনুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। (প. ১/১৭)

চিত্তবৃত্তির নানা ব্যাপ্তির আত্যন্তিক সূত্র হয়েছে যখন জগৎ অন্বয়ে স্থিত
এসেছে মনীষার ধারা জীবন মাঝের সব সূত্রের সমাপন প্রয়াসে
যেমন করে হয়েছে জীবনের এই পথমাঝে এগিয়ে চলার একান্ত সূত্র
তেমনই হয়েছে ব্যাপ্ত সমৃদ্ধ একান্ত ভাবপ্রকাশের এই নিত্য অন্বয়ে।
বিতর্ক-বিচার-এসেছে মনীষার সহজাত বৃত্তির সূত্রের জাগতিক ভাবে

আবার হয়েছে জগৎ কর্মে মাঝে মনের একত্বের ক্ষণে আনন্দ সংস্থান।
যে অস্মিতার ভাবময় প্রকাশ হবে এমন ক্ষণে হবে তারই একান্ত প্রকাশ জীবনে।

মনের-প্রাণে-হৃদয়ের শক্তি এখন সংযোজন হয়ে উঠবে প্রাণের মাঝে যা কিছু হয়েছে শুভ্র সত্য বোধ আর শুভ্র-জ্যোতির্ময়ীর আকাঙ্ক্ষা তার প্রতি। এমনভাব স্থিত হয়ে যায় অন্তর মাঝে যে শুভ্র-সত্য-ঋতই জীবনের জন্য স্বতঃই স্বাভাবিক। এই মনস্বাভাবিকতা জগতের নিরীখে বিরল। ভাগবতী বিকাশ পথের পর্বে এটিই স্বাভাবিক। ভক্ত মন-প্রাণ-হৃদয় এখন বুঝে যাবে জাগতিক বস্তু-বিষয় আর প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করা যেন জগতের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু এই প্রয়াসটি যদি ভাগবতী বোধের ভিত্তিতে হয়ে চলে তবেই হবে তার মাঝে দৃঢ় ভিত্তির এক অনন্য সাধন ব্রত। ভগবানকে জীবনে বরণ করে যদি হয়েছে নেওয়া তবে হয়ে উঠবে আত্মশক্তির জাগরণ। জাগ্রত আত্মশক্তি মানুষটিকে এগিয়ে দেবে এই জগতের মাঝে অনায়াস বিষয়ের পথে। বিষয়টি যদি হয় ভগবৎ পথের জন্য আবশ্যিক তবে সেটি ঘটবে। জগৎ মাঝে এখন শিবশক্তির বিজয় পর্ব! ভক্তপ্রাণ এই বিজয় নিয়ে আসবে।

Since human memory is not innately1 well designed to be superliable, fast-access, random access memory (Which every non Neumann machine needs), when the (culturally and temporarily distributed) designers of the von Neumamasque virtual machine faced the tark of cobbling up a suitable substitute that would run on a brain. They hit upon various memory enhancing Tricks. The basic Tricks are rehearsal, rehearsal more rehearsal, abetted by rhymes and rhythmic, easy to recall maxims. The deliberate repeated juxtaposition of elements between which are needed to build a link of association so that one item would always 'remind' the brain of the next was further enhanced, we may suppose by making the association as rich as possible, clothing them not just with visnal and auditory features. but exploiting the whole body. Our brains were not designed for word processing, but now a large portion perhaps even the adult man.

(Daniel C. Dennett, Consciousness Exploined, Back Bay Boks, New Your, 1991, p. 225.)

মনের রয়েছে নানা বিভাগ ও নানা প্রকৃতি। মানুষের চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে যায়। মনের অভ্যন্তরে তার ব্যাপ্তি ও প্রকাশের ধরনের উপর ভিত্তি করে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হল ঃ চিত্ত-মানস-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, চিত্ত হল মনের মাঝে সব ধরনের ইতিহাস-বর্ণনা-ঘটনা-অন্তরের মাঝে সৃষ্টি হওয়া অভিজ্ঞতা আর যত কিছু রয়েছে জীবন ও জগতের সূত্র — সবকিছুর একটা যেন জমান ও যত্ন সহকারে জমিয়ে রাখবার স্থান। এটির বহু অংশ রয়েছে যার সঙ্গে বর্তমানের ঘটমান বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। আবার এমন কিছু উপাদান চিত্তের থলিতে থেকে যায় যার আকর্ষণ বা আবেদন মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরাজ করে। চিত্তের থলিতে জমে থাকা বিষয়ের বিভিন্নতায় আকর্ষণও বিভিন্ন।

চিত্তমাঝে বিজয়ের স্মৃতি, আনন্দের স্মৃতি, সম্মান প্রাপ্তির স্মৃতি, ব্যাপ্তির স্মৃতি, বড় হওয়ার স্মৃতি, অর্জনের স্মৃতি, জগৎ মাঝে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে যাওয়ার স্মৃতি আর জগতে হয়ে উঠবার স্মৃতি ভেসে আসে চিত্তের পটে বারে বারে। এমন করেই বারে বারে হয়ে ওঠা জীবন মাঝে স্মৃতির পর্যায়ক্রমে ভেসে ওঠার পর্বগুলি জীবনের দীপ্তি ও ব্যাপ্তির বর্দ্ধক। এই উপাদানগুলিকে সমাদর করে মনের অভ্যন্তরে আহ্বান করে নিয়ে আসবার পর্বকে বলা হয় স্মৃতির রোমন্থন। স্মৃতির এই রোমন্থনের পথ দিয়েই এগিয়ে আসে অতীতের অনেক ভাল ও সম্ভাবনাময় অথচ ফেলে আসা দিকগুলি। এসব দিকেই রয়েছে জীবন মাঝে যে ভাগবতী সম্ভাবনা ও প্রকাশের উপাদানগুলি রয়েছে তাদেরই এক মিলন সম্ভার। এই মিলনসম্ভার জীবনকেই করে যায় ক্রমাগতভাবেই সমৃদ্ধ। স্মৃতির রোমন্থনের মধ্য দিয়ে যেসব বস্তু-বিষয় উঠে আসে যেগুলি স্বতঃই সুখকর। জীবনের বিজয়-অর্জন-ব্যাপ্তি-স্বীকৃতির দিকগুলি সব সময়েই দেয় প্রেরণা। এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা, নবীন বিজয়ের জন্য অভিযানের প্রেরণা ও মনের শক্তির সঞ্চার এর দ্বারা বেড়ে যায়। মনের শক্তি যতই প্রবল হয়ে উঠবে ততই আসবে জীবন মাঝে প্রাণশক্তির প্রবাহ। প্রাণ তার শক্তি আহরণ করে মহাপ্রাণ থেকে। আত্মশক্তির জাগরণে মহাপ্রাণ হয়ে ওঠে জীবনের জন্য নিত্য বিকাশী ও নিত্য এগিয়ে চলবার উপাদানকে জীবন মাঝে আত্যন্তিকে বরণ করে নিয়ে। এর দ্বারা মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। নতুন জীবন পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান। নতুন ভাবে জগতে বিস্তৃত হওয়া ও নতুন ভাব প্রেরণার কেন্দ্রভূমি ও চেতনার স্ফুরণকারী হয়ে যায় মন এসময়ে।

নবীন চেতনায় ঃ বিরাম-প্রত্যয়-অভ্যাসপূর্বঃ সংস্কার-শেষঃ অন্যঃ। (প. ১/১৮)
চিত্তের বৃত্তিসমূহ হয়েছে যদি স্থিত ক্ষণমাত্রায় এসেছে বিরাম।
মনের মাঝে চাঞ্চল্য প্রকাশ হয়ে চলবে নিত্য দিনের এই পথমাঝে
এমন প্রকাশই হয়ে উঠুক জীবন মাঝে সদা অন্বয়ী একান্ত ভাবপথে।

চিত্তের মূঢ়তার ক্ষণিক অবসানও এনে দেবে মনের মাঝে বিপুল সম্ভার।
এখন হোক ভাবমাত্রার গতিমুখ ক্রম অন্বয়ে এগিয়ে চলা একত্ব অভিমুখে।
যে বিক্ষিপ্ত স্পন্দন হয়েছে স্বাভাবিক মনের নিত্য বৃত্তি হোক সে স্তব্ধ।
জীবন মাঝে এখন চিত্তপ্রসাদ উঠবে ফুটে অভ্যাসের সরণি বেয়ে।
যা কিছু এগিয়ে আসা সংস্কার করে অতিক্রম হবে বরণ ভগবৎ ভাবপ্রদীপ।
শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধিপ্রজ্ঞা-পূর্বকঃ ইতরেষাং। (প. ১/২০)
একাগ্রতার সাধন পথে চলবে এগিয়ে যে মন হবে তারই ক্রম নিরুপণ
জীবন মাঝের কর্ম-চর্যা-মনন-চিন্তন প্রবাহে করতে শ্রদ্ধায় একান্ত নিরপণ।
জীবনের শক্তির এখন হবে দ্রুত সমন্বয় একান্ত বিকাশ পর্বে করতে বরণ জীবনে
সকল বৃত্তির ক্রম অবসান হবে দৃঢ় জীবন মাঝে অনন্ত ভাব বিকাশ পর্বে।
এখন ঐ ভাব বিকাশ শ্রদ্ধা মাত্রায় হয়ে শক্তিপথে ভরপুর করবে মূর্ত জগতে।
স্মৃতির বাধা করে অতিক্রম প্রাণের মাঝে গড়ে উঠবে নিত্য বিকাশ স্পন্দন।
নির্বীজ সমাধির এই ক্ষণ পর্বে হয়েছে বিচিত্র ভাব বিকাশ জগৎ মাঝে।
তীব্র সংবেদানাম আসন্নঃ। (প. ১/২১)
ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা। (প. ১/২৩)
একাগ্রতার অভিমুখ এসেছে যদি জীবন মাঝে স্বতঃ উদ্বোধনে।
যেমন করে উঠবে হয়ে জীবনের ভাব বিকাশ নিত্য পথের সন্ধানে
শ্রদ্ধায় হয়ে ভরপুর জীবন মাঝে হয়েছে যদি প্রত্যয়ের দৃপ্ত প্রকাশ
চেতনার হবে ভাগবতী ভাববরণ শ্রদ্ধায় জীবন মাঝে ভাগবতী শক্তি বরণে।
সাধন গড়ে দেবে অন্ত প্রকাশ মাঝে জীবন ভাবধারায় এগিয়ে চলা
এমন করেই প্রাণপ্রদীপ হয়ে উঠবে একান্ত ভক্তি-নিবেদন বিশ্বাস পথে।
ঈশ্বরে আবাহন জীবন মাঝে হয়েছে যখন সূচনা আর এগিয়ে চলায়
এমনই ভাববিকাশ জীবন মাঝে করবে মূর্ত চেতনার পরিপূর্ণ নিবেদনে।

শিবচৈতন্যের জাগরণ ঃ মনের মাঝে ফুটে ওঠে যদি উবসাদ-অন্ধকার-বেদনা-ক্ষোভ-কোনও অবমাননা-লাঞ্ছনা অথবা প্রত্যাখ্যান বা পরাজয়ের স্মৃতি তবে ভক্তমন বা সাধক মন সেসব বিষয় ও স্মৃতিকে সরিয়ে দেবে দূরে। আর সাধন পথে, ভক্তি মার্গে এগিয়ে ক্রমে ভগবানকে বরণ করে নতুনভাবে নিজেকে সাজিয়ে নেবে। ধ্যানে-মননে-চিন্তনে সাধক মন একান্তভাবে এক নিবিড় ও ঘন উপলব্ধির বিন্যাস করবে আর এগিয়ে যাবে নবীন যাত্রাপথে। এই পথ আলোকময়। এই নবীন পথের মাঝে রয়েছে ক্ষমা-দয়া-দান-নিবেদন। ক্ষোভ ও ক্রোধের কোনও স্মৃতি বা বিষয় যদি থেকে থাকে তবে তাকে করতে হয় ক্ষমা। ঈর্ষা-অভিমান-প্রতিশোধের দিকে যদি আসে মনের গতি তবে তাকে রুখে দিতে হবে। নিজের অভ্যন্তরে বাস করছেন স্বয়ং শিব সনাতন। তিনিই পরমাত্মা। জীবন মাঝে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ স্থানে তাঁর অবস্থান হৃদয় মাঝে। যে মন এমন পথে এগিয়ে যেতে পারে তার শ্রীলাভ, বিজয়, বিস্তৃতি ও বিকাশ অনিবার্যভাবে ঘটে যাবে। সবচেয়ে বড় হয়ে উঠবে তার মন এখন ক্ষিপ্ত নয়; মূঢ় অবস্থাকে পিছনে ফেলে মন এখন প্রজ্ঞার পরশ পেতে শুরু করবে। মনের মাঝে এখন গড়ে উঠবে শিবানুভূতি। চিৎ-আনন্দরূপ শিবচেতন মনের গভীরে অবস্থান করে চলেছেন। তিনি এখন হবেন জাগ্রত। ভগবান এখন অন্তরে হবেন জাগ্রত। মনের মন বৃত্তিগুলিকে সংহত করে রয়েছেন অন্তরের অধিষ্ঠানে গ্রথিত।

এখন শুধুই আনন্দ-প্রজ্ঞা-আর সত্যের ক্রম উন্মোচন পর্ব। জীবমময় হয়ে রয়েছেন তিনি গ্রথিত। তিনিই নিত্য সখা। তিনিই জীবনের একান্ত আপন। তিনি অদৃশ্যে-অলক্ষে-মহাশূন্য হয়ে জীবনের গতিপথ করে দেবেন সঠিক।

এখন জগৎময় শিবচেতনের ব্যাপ্তির পর্ব হয়েছে উন্মোচন। পরমাত্মা শিব সনাতন এখন জীবের সব সংস্কার-কর্মফলের গণ্ডী দেবেন পার করে সব শরণাগতকে। হে জীবসকল, হে মানবচেতন হয়ে ওঠ এখন আনন্দঘন-চেতন-সত্যের জগৎ প্রকাশ। শিবচেতন জগতের মাঝে ফুটিয়ে তুলবে দৈবী প্রকাশ। শিবচেতন হবে জীবনে ব্যাপ্ত সব অভীপ্সুর জীবন মাঝে।

—ঃঃ—

ভগবানই চিরন্তনী সত্য

তানিয়া ঘোষাল

ভগবানই একমাত্র চিরন্তন সত্য। বাকি সবকিছু এই জগৎ, এই জীবন, এই সমগ্র সৃষ্টি সবই সেই সেই চিন্তন সত্যের আংশিক প্রকাশমাত্র। তিনি পূর্ণসত্য। আমরা তাঁর অংশপ্রকাশ। আমাদের অস্তিত্বের প্রস্ফুটন তাঁর মধ্যেই ঘটে। তিনি আমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন। আমরা তাঁর মধ্যেই সবাই রয়েছি। সবকিছু, এই জগৎ সংসার তাঁরই মধ্যে বিরাজিত। এই জগৎ সংসার তাঁতেই শুরু, তাঁতেই শেষ। এই সৃষ্টি বা মানুষের মধ্যেই তিনি পূর্ণসত্য হয়ে বিরাজ করছেন, কোথাও তিনি নিজেকে করেছেন প্রকাশিত, কোথাও আবার অপ্রকাশিত। তবে যে প্রাণ ভগবৎ ভাবরসে মজে যেতে চায়, সেই প্রাণকে ভগবান কৃপা করে সেই দিব্যভাবরসের উৎসদ্বার সেই ভক্ত হৃদয়ে উন্মোচন করে দেন। সেই হৃদয় তখন ভাগবতী ভাবরসে সিক্ত হয়ে ওঠে। সেই সাধক হৃদয়ে তখন ভাগবতী উপলব্ধির দ্বার একটু একটু করে উন্মোচিত হতে থাকে। উপলব্ধির পথে ভগবৎ বার্তা সেই সাধক জীবনে বর্ষিত হয়। ভগবানকে জীবনের যত গভীরে বরণ করা যাবে এই উপলব্ধির দ্বার ততবেশি প্রশস্ত হবে। জীবন যখন বিপুল কর্মে নিয়োজিত হবে তখন সেই কর্মপথ বেয়েই নেমে আসবে উপলব্ধির স্রোত। যতবেশি কর্ম তত বেশি উপলব্ধি। ভগবান এক, আবার তিনি অনন্ত। এক তিনিই আবার অগুণতি রূপে, ভাবে, চিন্তনে বিরাজ করছেন এবং এই ভাব বাস্তবিকভাবে জীবনে উপলব্ধি করা সম্ভব কর্মের মাধ্যমে. কারণ কর্মপথ এমন একটি পথ যেখানে ভাবগবতী জ্ঞান, ভাগবতী সত্যকে আসলেই জীবনের পটভূমিতে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, কর্মের মাধ্যমে সাধক জীবনকে ভাগবতী সত্যানুসারে বাঁচতে শেখে। জীবন যখন কর্মের মাধ্যমে এগিয়ে চলে তখন নানা ধরনের অভিজ্ঞতা সেই কর্মপথ বেয়ে জীবনের কাছে এসে জীবনের ভাগবতী উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

যিনি সাধক বা ভক্ত তিনি এই ভাগবতী কর্মোপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। যে কোনো কর্মের আসলে দুটি দিক থাকে। একটি হল কর্মের জগৎ প্রকাশ বা বাহ্যিক প্রকাশ। অপরটি হল কর্মের অন্তঃপ্রকাশ বা সারমর্ম। কর্মের অন্তঃপ্রকাশটি হল কর্মের গঠনগত ও মানগত চরিত্র যা কর্মের উপর যে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার উপর নির্ভরশীল। অপরদিকে যে অভিজ্ঞতা কর্মী অর্জন করেছেন কর্মের মাধ্যমে অথবা তার নিজ জীবনে চলতে চলতে। এই অভিজ্ঞতার ও দুটি দিক রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার একটি রয়েছে জাগতিক রূপ যেটা জগৎ সেই কর্মীকে দেখছে আপাত দৃষ্টিতে অর্জন করতে যা সেই কর্মীর জগতে ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। অপরদিকে সেই কর্মী যদি ভাগবতী কর্মী হয় তবে ঐ কর্মের তার ব্যক্তিগত বা আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা হবে ভগবৎ উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ যা জগতের অগোচরেই হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক বা জাগতিক দৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট একটি ঘটনা সুখকর বা বেদনাদায়ক মনে হলেও আসলে সেই অভিজ্ঞতা সাধককে অর্জন করানো হচ্ছে তার হৃদয়কে এক অমূল্য, অনির্বচনীয়, অব্যক্ত ভাগবতী সম্পর্কে সমৃদ্ধ করবার জন্য। তাই জগতের দৃষ্টিতে আপাতভাবে কোনো ঘটনা সুখকর না হলেও যে ব্যক্তি ভগবানকে জীবনে ধারণ করতে, বরণ করতে চাইছেন এবং তা করতে পারছেন তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন যে যা ঘটছে তার জীবনে তা আসলে তাকে সাধক হিসাবে আরও পরিপক্ব এবং সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যই ঘটছে। তাই জগতে অন্য মানুষের কাছে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা সুখকর বা দুঃখজনক মনে হলেও ভাগবতী সাধকের কাছে তা তার সাধনপথে এগিয়ে যাওয়ায় সহায়ক এক উপলব্ধির রূপ ধারণ করে সাধন জীবনে নেমে আসে। তখন সাধকরে কাছে সেই ঘটনা সুখ বা দুঃখের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে না, সাধকের কাছে সেই ঘটনা ভগবৎ বার্তারূপী ভগবানের আশীর্বাদের মোড়কে উপস্থিত হয়। অপরদিকে কর্মের জগৎ প্রকাশ এবং তার বাহ্যিক ফলাফল নির্ভর করে সেই কর্মের পিছনে কর্মীর যে মনোভাব ও তার গঠনগত চরিত্রের উপর।

প্রতিটি ঘটনার মধ্যে আসলে দুরকমের সত্য থাকে। প্রথমতঃ জাগতিক সত্য বা Empirical Truth অন্যদিকে ভাগবতী সত্য বা Eternal Truth । জাগতিক সত্য হল যে সত্য আমরা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। যা আমাদের বোধগম্য। যে সত্যের একটি গঠন, নির্দিষ্ট পরিকাঠামো আছে, যা আমাদের দৃষ্টিগোচর। জাগতিক সত্য ঐ পরম সত্যের আংশিক প্রকাশ। জাগতিক সত্য চিরন্তন নয়। জাগতিক সত্য পরিবর্তনশীল। জাগতিক সত্য স্থান ও কাল সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আজ যা জগতে সত্য বলে মনে হচ্ছে, ভিন্ন সময়ে, ভিন্নস্থানে তা সত্য নাও হতে পারে। অন্যদিকে Eternal Truth বা ভাগবতী সত্য চিরন্তন, এটাই চিরকালীন চূড়ান্ত সত্য। ভাগবতী সত্য স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে একইভাবে বিরাজমান। ভগবান স্থান, কাল পাত্র দ্বারা কোনোভাবে আবদ্ধ নন। তিনি রূপে বিরাজমান, আবার অরূপেও বিরাজমান। যে তাঁকে কোনো এক বিশেষরূপের মাধ্যমে জীবনে পেতে চেয়েছেন তিনি তাঁকে সেই রূপেই ধরা দিয়েছেন। ভগবানই একমাত্র চিরকালীন সত্য বাকি সব কিছু সেই সত্যেরই অংশ প্রকাশ। মানুষের কাছে যা তার সীমিত দৃষ্টি, শক্তি, বোধের বাইরে সেটাই অসত্য বা অস্তিত্বহীন। ভাগবতী সত্য হল এমন এক সত্য যা মানুষের সীমিত দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি, সীমিত অনুভব শক্তির বাইরে। মানুষ দৃষ্টি, বোধ, অনুভবের এই সীমা রচনা করে মনের গণ্ডীর রচনার মধ্য দিয়ে। গণ্ডী রচনার মাধ্যমে মন তখন নিজেকে বদ্ধ করে ফেলে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে যেটি স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে হতে পারে। তখন এই বদ্ধ মনের কাছে জাগতিক সত্যই আসল সত্য বলে ধারণা হয়। আংশিক ও ক্ষণিকের সত্য তখন পূর্ণ সত্য বলে বোধ হয়। বদ্ধমন ভগবানকে চিনতে, বুঝতে, জানতে অস্বীকার করে। বদ্ধ মনের দরজা ভেদ করে ভাগবতী সূর্যের কিরণ মনের মধ্যে প্রবেশ করে না। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে তাইলে তিনি প্রবেশ করতেই পারেন, কিন্তু সাধারণত তিনি মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। যে যেমনভাবে চলতে চেয়েছেন, তাকে পূর্ণস্বাধীনতা দিয়েছেন তিনি।

আসলে মন যতক্ষণ নিজেকে সেই ভাগবতী সূর্যকিরণের জন্য প্রস্তুত না করছে ততক্ষণ সেই কিরণ মনের বদ্ধ অবস্থা ঘোচাতে

পারে না। যেমন সূর্যদেব রোজ সকালেই উদিত হন স্বমহিমায় জগতকে নিজ আলোকে উদ্ভাসিত করবেন বলে, কিন্তু সেই কিরণের স্পর্শ তিনিই লাভ করতে পারবেন যিনি আগের দিনের রাতের ঘুম থেকে জেগে উঠবেন। যিনি ঘুমিয়ে থাকেন তার কাছে সূর্যের কিরণ পৌঁছাতে পারে না। একজন ব্যক্তিকে যদি চোখে একটা কাপড় বেধে তীব্র আলোর সামনে নিয়ে যাওয়া হয় তাও তার দৃষ্টি থেকে অন্ধকার সরবে না। যতক্ষণ না সে কাপড়টা চোখ থেকে সরিয়ে ফেলছে। মনের দরজাটা খুলে যিনি নিজেকে ভগবৎ রশ্মির জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারবেন তারই হৃদয় থেকে সমস্ত অন্ধকার সরে গিয়ে হৃদয় ভগবৎ আলোয় পূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই হৃদয় তখন নিত্য ভগবৎ আলোয় স্নাত হয়ে উঠবে। হৃদয়ে যে ভগবৎ সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের সকলের এ যেন এক পদ্মের কুঁড়ি। সূর্যের আলো না পেলে পুষ্পকুঁড়ির প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা হয় না। যেই মাত্র হৃদয় বার উন্মুক্ত হয়, সাধকের আহ্বানে ভগবৎ রশ্মি হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং হৃদ্‌পদ্ম একটু একটু করে উন্মোচিত হতে শুরু করে। হৃদয়ে ভগবৎ অধিষ্ঠানের জন্য আসন রচনা হয়ে যায়।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মম অঙ্গানি, বাক্, প্রাণঃ, চক্ষু
শ্রোত্রম অথঃ বলম ইন্দ্রিয়ানি চ সর্বাণি। (সামবেদ)

ভগবানকে সাধক তার অঙ্গে অঙ্গে আপ্যায়ণ করছেন। ভগবানকে আপ্যায়ণ করা হচ্ছে বাক্যে অর্থাৎ তিনি আমাদের বাক্যে এসে স্থিত হলে সাধকের হৃদয় এবং মুখ থেকে সদা সর্বদা ভগবৎ বাক্য নিঃসৃত হবে। সাধক আহ্বান করছে ভগবানকে তার প্রাণে স্থিত হতে, যার ফলে সেই সাধকের প্রাণশক্তি ভগবৎ স্পর্শে হয়ে উঠবে দিব্য প্রাণশক্তি যা তাকে ভগবৎ পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে। সাধক ভগবানকে তার চক্ষুতে স্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যাতে সেই চক্ষু ভগবৎ দর্শনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। সর্বোপরি সাধক ভগবানকে তার সমস্ত অঙ্গে আহ্বান করছেন স্থিত হতে। সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে যখন ভাগবৎ উপস্থিতি অনুভূত হয়, যেন শুধু হৃদয় নয়, সাধক দেহের সমস্ত অঙ্গ, শিরা, উপশিরা, কোষে ভগবৎ নাম গুণগানে বিভোর হয়ে উঠতে চায়। ভগবৎ স্পর্শ পেয়ে সাধক এখন ভগবানকে চিরকালের জন্য অঙ্গে অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানায়।

ওঁ বাক্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম
আবিঃ আবিঃ মে এধি

কাউকে নিজগৃহে আপ্যায়ণ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থাৎ থাক্‌বার কথা বললে তিনি অতিথি হয়ে যান অর্থাৎ তার আসাটা ক্ষণিকের এবং ফিরে যাওয়াটা অনিবার্য। তাই সাধক প্রাণ ভগবানকে শরীররূপী গৃহে আহ্বান জানিয়ে এই গৃহেই চিরকাল অবস্থান করার অনুরোধ জানাচ্ছেন। সাধকের মনের দরজা এবার উন্মুক্ত হয়েছে এবং সেই দরজা দিয়ে ভগবৎ আলো প্রবেশ করছে সাধকের হৃদয় কন্দরে। হৃদয়ের কোনা কোনা ভগবৎ আলোয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যা কিছু অন্ধকার দিয়ে এতদিন তা সমস্ত দূরীভূত হয়েছে ভগবৎ আলো হৃদয়ে প্রবেশ করবে। এই আলোই এবার সাধককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলবে ভগবৎ অভিমুখে। "মানবের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলে তার জীবন পর্ব। যেমন করে হয়েছে মনের গড়ন, তেমনই প্রবণতা ক্রমে অধিকার করে মানবজীবনকে। জীবনের চলার পথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একদিকে আর অন্যদিক জীবনের বৃত্তিসমূহ এসবের মৌল সংযোগ এসে যায় মানবের কর্মচিন্তা—কর্মপরিকল্পনা ও জীবনকর্মের মাঝে। জীবন কর্ম আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনার মিলনে গড়ে ওঠে। একদিকে ওই কর্মের প্রবাহে যেমন করে চলছে জাগতিক বোধের কর্মাদি আবার অন্যদিকে তাদের মিলিত এক অনবদ্য জীবনভূমি যার অন্তর মাঝে কখনও ফুটে ওঠে সেই আকুতি যার লক্ষ্য হল পরম সত্যের আহ্বান। জীবন মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরগুলি অধীর প্রতীক্ষায় থাকে কখন ওই জীবন পটভূমি নিজ বিবেক আবাহন করে আসবে জীবের জীবচেতনের নিকটে। যে চেতনমাত্রা ছিল দূরগামী ওই অন্তর প্রসারী পরম চেতনের স্পর্শ পাওয়ার অনাবিল প্রতীক্ষা যেন জীবনের পরিচয়কেই দূরের এক অনাগত আকর্ষণের আহ্বানে নিয়ে চলে স্বাতন্ত্রে। প্রতিটি জীবন চেতনই এমন স্বাতন্ত্র গড়ে নিয়ে হয়ে ওঠে যেন নিত্য জাগরণী। এমন করেই হয়ে উঠবে জীবনময় দিব্যন্যাস। ভগবানের কাছে চলে আসবার আনন্দই এখানে আকর্ষণী। যেন ঐ আনন্দেরই কিঞ্চিৎ আশ্বাস সে আনন্দের দ্বীপ পঞ্চককে শিখাময় করে দেয় এক অনাবিল আনন্দের জগতে। বেদনা-দুঃখ-রাগ-অভিমান-হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষা-কাম-বাসনা-অহং এসবই যেন একে একে গলে যেতে থাকে। একটির পর একটি পর্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে এসবের মধ্য থেকে উঠে আসা চেতন কণাগুলির। একে অন্যের পারস্পরিক অভিযোজন পেরিয়ে এখন গড়ে উঠবে ভক্ত ভগবান পর্ব। (Ref: "ব্রহ্মচেতন হোক জাগ্রত"-ড. রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতৃশক্তি, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা-৬৫)।

সাধনপথ ওঠা নামায় থাকে ভরপুর। এই ওঠানামা কেবল বাহ্যিক নয়, আভ্যন্তরীণ ওঠানামাও। প্রতিটি মানুষের জীবনে দুরকমের জগৎ থাকে। একটি হল তার বাহ্যিক জগৎ অপরটি হল তার অন্তর্জগৎ। একজন সাধকের কাছে বাহ্যিক জগতের পরিস্থিতির থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তার অন্তর্জগতের পরিস্থিতি। সাধারণভাবে সাধন পথে চলতে চলতে সাধককে অনেক রকম বাধার সম্মুখীন হতে হতে পারে। প্রতিরোধ করবার শক্তি তেমনভাবে থাকে না, যদি সেই সাধকের অন্তর্জগৎ অর্থাৎ মনের মাঝে কোনো মেঘ জমাট বাধে। যখন সাধকের অন্তর্জগতের আকাশ পরিষ্কার দেবসূর্যের আলোয় ঝলমল করে তখন বহির্জগতের অধিকাংশ বাধাই পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় সাধকের সাধনপথের সহকারী উপাদানে। কিন্তু মেঘ যদি মনে জন্মায়, মনে যদি একবার সাধক বাধার পাহাড়কে গড়ে উঠতে সম্মতি দেন তখন বহির্জগতের হাজারও সাহায্যের হাত তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না সাধন পথে।

একটি বাস্তবিক পরিস্থিতিকে উদাহরণ হিসাবে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। মহাভারতের যুদ্ধের পটভূমি। কৌরবদল এবং পাণ্ডবদল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। একদল অধর্মের প্রতীক (কৌরবদল)। অধর্মকে যতরকম কার্যদ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব

তা সবই তাদের নখদর্পণে। অপরদিকে ধর্মের প্রতীক (পাণ্ডব দল) ধর্মের ধ্বজা হাতে দাঁড়িয়ে অধর্মের মূল সমাজ থেকে উপড়ে ফেলে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে। পাণ্ডবদলের মহান যোদ্ধা অর্জুনের রথের সারথীরূপে ধর্মের পক্ষে দাঁড়িয়ে অধর্ম ও ধর্মের যুদ্ধে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কোনোরকম অস্ত্র তিনি ধারণ করবেন না যুদ্ধে। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন। দু'পক্ষের যুদ্ধ শঙ্খে ফুৎকারের মাধ্যমে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। অর্জুনের মনে কালো মেঘের আগমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করলেন তার রথটি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দুই দলের মাঝখানে এনে দাঁড় করাতে। ভগবান তাই করলেন। অর্জুনের উদ্দেশ্য দুটি দলকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা। অর্জুন দেখছেন পিতামহ ভীষ্ম যিনি তাকে ছোটোবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন তার সাথে যুদ্ধ করে অর্জুনকে তাকে বধ করতে হবে কারণ তিনি অধর্মের পক্ষে দাঁড়িয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। গুরু দ্রোণাচার্য যিনি নিজেকে নিঃস্ব করে অর্জুনকে করে তুলেছেন অস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শী। অর্জুন ছিলেন গুরু দ্রোণের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। তিনিও দাঁড়িয়ে অধর্মের পক্ষে। যুদ্ধে গুরুকেও হত্যা করতে হবে। কৌরবদের গোটা বংশ অর্থাৎ নিজ বংশকে হত্যা করতে হবে। কত সৈন্য হত্যা হবে, সমাজরে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে। অর্জুনের নিজের পক্ষের মানুষ হতাহত হবে এই যুদ্ধে। একটি অতি সাধারণ মানসিক চিন্তা (যা একজন যোদ্ধাকে শোভা পায় না) অর্জুনের ধার্মিক সাধক মনকে এসে ঘিরে ধরল। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধে অর্জুন ভগবান দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন ধর্মের ধ্বজা হাতে এগিয়ে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। অধর্মের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই অর্জুনের মনে এই মানবিক বিকার অন্ধকার মেঘের রূপ নিয়ে মনকে ঘিরে ধরল এবং এতটাই তার প্রভাব যে অর্জুনের মত একজন শক্তিশালী সাধক যোদ্ধা এই চরম মুহূর্তে এসে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তার পা কাঁপছে, সমগ্র শরীর ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠছে, হাত থেকে গাণ্ডীব (অর্জুনের ধনু) খসে পড়ে যাচ্ছে। রথের উপর তিনি বসে পড়লেন। ধর্মযুদ্ধের জন্য ভগবান দ্বারা নির্বাচিত ধর্মের ধ্বজাধারী অর্জুন ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ভগবান এই চরম পরিস্থিতিতে অর্জুনকে সামলাতে কালকে স্তব্ধ করলেন। অর্জুনকে, সর্বোপরি সমগ্র সৃষ্টিকে চিরকালের জন্য অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে তিনি উপহার দিলেন ভগবৎ-গীতা। অর্জুনের মত একজন শক্তিশালী যোদ্ধা, যে ধর্মের প্রতীক তার মনেও দুর্বলতার মেঘ জমাট বাধলো। কিন্তু অর্জুন যেটা করলেন তা হল যতই অন্ধকার অর্জুনকে ঘিরে ধরুক, তিনি ভগবানকে ধরে রইলেন। ভগবানকে ছাড়েননি। তিনি ভগবানকে ধরে রইলেন। ভগবানকে ছাড়েননি অর্জুন। তিনি দুর্বল হয়ে রথের উপর বসলেন, কিন্তু বসলেন ভগবানের পদতলে, ভগবানের হাতটা ধরে রইলেন। যদিও মোহরূপী অন্ধকার এসে অজুর্নের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করল কিন্তু অর্জুন সেই অন্ধকারকে অন্ধকার হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। সে অন্ধকারকে আলো ভাববার ভুলটা করেনি। অর্জুন ভগবানকে বললেন ঃ

অর্জুন উবাচ ঃ

কার্পণদোষাপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতা।
যচ্ছ্রেয়ঃ ময়ান্নিশ্চিতঃ ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম।।

"কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি এবং আমার কর্ম সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঙ্কর, তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।"

অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন তার মনোভাব ধর্মযোদ্ধা হিসাবে তার কর্মপথের বিপরীত। তাই যদিও তার মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে, কিন্তু তিনি হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন ঐ দিব্য আলোকে আহ্বান করেছিলেন নিজ হৃদয়ে প্রবেশ করতে এবং ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন অর্জুনকে আলোর পথ দেখানোর জন্য। তিনি তো ভক্তের ভগবান। ভক্তের আহ্বানে সাড়া না তিনি যাবেন কোথায়। ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণীর রূপ ধরে ভাগবৎ গীতার জন্ম হল, নেমে এল সৃষ্টির বুকে এক দিব্য আলোক ধারা অর্জুনকে এবং অর্জুনের মত আরো অনেক সাধককে চিরকালের তরে অন্ধকারের গহ্বর থেকে দিব্য আলোর পথ বেয়ে পরম চৈতন্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—ঃঃ—

কৃষ্ণ—কানাইয়া

তুলি চ্যাটার্জী

ভগবান কৃষ্ণ কানাইয়া ও কানাইয়া কৃষ্ণ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন জগৎ পালনে। ভগবানের নিজ মুখ নিসৃত বাণী—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারত
অভ্যুথানম অধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।।

ধর্মযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে ভগবান যে জ্ঞান প্রদান করলেন মহাত্মা, মহাযোদ্ধা অর্জুনকে, যা ভগবৎ গীতা রূপে মানব সমাজকে উপহার দিলেন সেই ভগবৎ গীতাতেই ভগবান স্বয়ং মানব সমাজকে জানিয়ে দিলেন যে যতবার যে জগৎ গ্লানিতে পরিপূর্ণ হবে ততবারই ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন এই ধরা ধামে এবং অর্ধমকে বিনাশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। ভগবান এই বারে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হলেন সেই একই উদ্দেশ্যে, তাঁর লীলা সংকলিত হল ভাগবতে। ভগবান কী শুধুই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন নাকি ভক্তি বিতরণও করলেন সেই সব ভক্তি পিপাসু হৃদয় যে সব হৃদয় সময়ের বিভিন্ন পর্যায় অপেক্ষা করে রয়েছে যুগ যুগ ধরে ভগবানেরই অপেক্ষায়। ভগবান সেইসব ভক্ত হৃদয় গড়ে দিলেন আপন মন্দির। আর সেই মন্দিরেই রাজা হয়ে রইলেন চিরকালের জন্য।

ভগবান কৃষ্ণ কানাইয়া আর কানাইয়া কৃষ্ণ একই জীবনের দুটি অধ্যায়, এই দুই অধ্যায় বাইরে থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা মনে হলেও অন্তরে ভীষণ রকমভাবে এক হয়ে রয়েছেন। ভগবান জীবনের আদি থেকেই পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে প্রকাশিত হলেন—কারাগারের অন্ধকারে মাতা দেবকীর কোলে, কারাগার আলোয় আলোময় হয়ে গেল। তারপর প্রবল দুর্যোগের মাঝে তাঁর গোকুলে গমন। তাঁর জন্মলগ্নই তার এই অবতার জীবনের উদ্দেশ্য কে ব্যাখ্যা করে এবং আগামী জীবনের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটকে রচনা করে দেয়। ভগবানের শৈশব কাল যেন প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে, নানা সময় নানা প্রকারের হানিকারক বিষয়-এর সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে, তথাপি এক শিশু গোপাল যেন খেলতে খেলতেই মা যশোদার কোলে বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর জীবনের সূচনা কালেই তিনি বিভিন্ন অতিলৌকিক বিষয়ের দ্বারা জীবন পথ রচনা করতে থাকেন। ভাগবতে সে সব রাক্ষস বধ, কালিয়া দমন, গোবর্ধন পর্বতের উপাখ্যান আছে সেই সবই ভগবানে বাল্যলীলা। এই প্রতিটি ঘটনা পরম্পরাকে যদি এক সূতোয় গাঁথতে হয় তবে বলা যায় যে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই যার সংহার করেছেন তাঁকে উদ্ধার করেছেন তাঁর মহাকালে লীলায় অংশ, করে কোল দিয়েছেন আর যাকে রক্ষা করেছেন তাঁকে ও চিরকালের জন্য আশ্রয় দিয়েছেন। কেউই বাদ পড়েনি তাঁর ভক্তি প্রসাদের থেকে যে যার যোগ্যতা অনুসারে প্রাপ্ত হয়েছেন ভগবৎ সঙ্গ, ভগবানের কোল। কিন্তু ভগবান যাঁকে একবার গ্রহণ করেছেন তাঁকে কখনো ত্যাগ করেনি। যেই তাঁর সঙ্গ লাভ করেছে সেই মুক্ত হয়েছে জাগতিক মালিন্য থেকে।

কানাইয়া কৃষ্ণ ভগবানের বাল্যকালের একটু পরের পর্যায়। ভগবানের বৃন্দাবন পর্বের সময়। যখন ভগবান বৃন্দাবনের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছেন। সাম্প্রতিক কালেও ভগবানের গোপাল রূপ পূজিত হয় প্রতিটি ঘরে ঘরে, সন্তানরূপে। কারণ এই সময় ভগবান বৃন্দাবনের প্রতিটি ঘরে ঘরে উপস্থিত হচ্ছেন। এই বৃন্দাবন পর্বেই ভগবান মাখন চোরা হয়েছেন, মাখন চুরির আছিলায় ভগবান হরণ করে আনছেন প্রতিটি ঘরের দুঃখ, যন্ত্রণা আর অভাবকে, আর প্রতিটি ঘরকে ভরিয়ে তুলছেন ভক্তি ভালোবাসা আর সম্মৃদ্ধি দিয়ে। ধনে, ধান্যে, আনন্দে ভরে উঠতে প্রতিটি ঘর। ভগবান হয়েছেন রাখাল বালক, তার বাঁশির সুরে গরুদের হৃদয়ও ভরে উঠছে তাদের দুগ্ধ মিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। যে স্থানে তিনি গরু চরাচ্ছেন সেখানে উপস্থিত সকল গাছ, মাঠের ঘাসগুলিও যেন আনন্দে নৃত্য করছে। সেই সকল গাছ, মাঠের ঘাস, পাখি, পশু, ধূলিকণা যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তারা প্রতিটি প্রাণই যেন আনন্দ পরিপূর্ণ হৃদয় নৃত্য করতে করতে কর্ম করে চলেছে, তাই তাদের প্রতিদিনের কর্মের মানই যেন সর্বচ্চ উচ্চতায় উপনীত হচ্ছে। ভগবানের বাঁশির সুর প্রবেশ করছে সেই সব ভক্ত হৃদয় যাঁরা সদা সর্বদা তাঁরই অপেক্ষায় রত হয়ে আছে। তিনি তাঁর বাঁশির সুরের সাথে প্রবেশ করছেন সকল ভক্ত হৃদয়, যে যে অবস্থান সে কর্মেই লিপ্ত হয়ে আছে সে সেই অবস্থায় সব কাজ ফেলে ছুটে চলেছে ভগবানের দিকে, সে যেন এই বাঁশির সুরের অপেক্ষাতেই বসেছিল, বাঁশির সুরের আহ্বানে তাই দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলেছে ভগবৎ অভিমুখে। প্রতিটি ভক্ত হৃদয় ভগবান রচনা করছেন ভগবত লীলা, এই লীলায় ভগবান ভক্ত হৃদয় ভগবান রচনা করছেন ভগবত লীলা, এই লীলায় ভগবান ভক্ত সম্পর্ক রচনা হচ্ছে। প্রতিটি ভক্ত হৃদয় যেন নানা ভাবে সেবা করে চলেছে ভগবানের, যে যে ভাবে পারছে সেবা করছে, কেউ এতক্ষণ তার পদধ্বনির আশায় বসেছিল, কেউ তার পাদ অর্চনা করছেন, কেউ তাঁকে বিভিন্ন রূপে, নানা সাজে সজ্জিত করে তুলেছেন, কেউ তাঁর প্রিয় আভরণ জোগাড় করে আনছেন, কেউ তার প্রিয় ফুলের মালা আনছেন কেউ আবার তার প্রিয় ফলমিষ্টি পরিবেশন করছেন। এই সবকিছুর মধ্যে তারা সবাই কানাইয়া ময় হয়ে আছেন যেন তারা সবাই তাদের সারাদিনের রসদ রূপে ভগবানের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলিকে হৃদয় নিয়ে চলেছেন আর তার সঙ্গে অদর্শনের মুহূর্তে সেই দৃশ্যগুলি যেন তাদেরকে বাচিয়ে রাখবে। ভগবান যেন সবার মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে। যেন নিজেই বহুতে বিভক্ত হয়ে সবার সাথে লীলা করে চলেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন লীলায় ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর নিবেদনে। নিজেকে নিবেদনে প্রতিষ্ঠানের একটা উদ্দেশ্য ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হবে। ভগবৎ ভাবে পরিপূর্ণ এক ভালোবাসায় ভরা হৃদয় তনুকে তারা নিবেদন করে চলেছে ভগবানের কাছে। নিবেদন এতটুকু বিচার না করে, ভগবানকে নিবেদন করছেন সবাই, সবার উপাদান একটাই সবাই নিবেদন করছেন সম্পূর্ণরূপে নিজেকে, সম্পূর্ণতায়। সম্পূর্ণতা থেকে এতটুকু কমও যদি হয় তবে তা ভগবানের কাছে নিবেদন যোগ্য নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় গোপগোপী গণের সাথে পাড়ের কড়ির এক উপাখ্যান আছে। যেখানে যেখানে ভগবান নৌকোর মাঝির বেশে উপস্থিত গোপগোপীগণ তাদের পশরা সাজিয়ে হাটের দিকে চলেছেন। নদী পাড় করতে হবে, ওই পাড়ের হাটে বিকিকিনি হবে, নৌকো ওপর কানাইয়া উপস্থিত, যেতে হলে তার নৌকাতেই যেতে হবে। এবং তিনি এক আনা, দু আনা, তিনি আনাতে নদী পাড় করাবেন না, অন্যান্য সব মাঝিরাই অন্যান্য দিন অনেক কমেই নদী পাড় করিয়ে দেন, কিন্তু আজ যিনি মাঝি রূপে অবতীর্ণ তিনি ষোল আনার কমে নদী পাড় করবেন না। সবার নানা ওজর আপত্তি কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই রাজি হবেন না। এই উপাখ্যানে অভ্যন্তরে যে ভগবৎ সত্য আছে তা হল, ভগবান সম্পূর্ণ নিবেদন ছাড়া জগৎ তরী পাড় করাবেন না। এই বিশ্বের কর্তা তিনি; তিনিই ভক্তের কাণ্ডারী, তিনিই ভক্তের ত্রাতা, তিনি দায়ে নিয়েছেন ভক্তের কিন্তু তিনি ভক্তকে ছাড়েনও না, ফেলেনও না। সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন না হলে পার করবেন না আবার সম্পূর্ণ নিবেদন না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বেনও না। ভগবান ভক্তের চেয়েও বেশী অপেক্ষা করতে পারেন, করেনও তাই। কিন্তু ভক্তের হাত ছাড়েন না। বৃন্দাবন তত্ত্বের এইটাই বিশেষত্ব যে ভগবানের প্রতি ভক্তের সম্পূর্ণ নিবেদন, এইখানে ভক্ত নিজেকে প্রস্তুত করে ভগবানের মনের মতো করে। ভক্ত ভগবানের মনের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তোলে, ভগবানেরই মনের মতো করে গড়ে ওঠে তবেই ভক্ত নিবেদন যোগ্য হয়। এই পর্বে কানাইয়া ভক্তির রাজা, তিনিই ভক্তি প্রদান করেন, ভক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি জগৎকে শিক্ষা দেন শ্রেষ্ঠত্বের, ভক্তিতে নিবিড় হৃদয় কিভাবে জগৎ কর্মে হয়ে ওঠে নিপুণ এবং জগৎ ভরে ওঠে সম্মৃদ্ধিতে। ভগবান ভক্তির মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত করে জগৎকে, জগৎ হয়ে ওঠে মালিন্য মুক্ত আনন্দে ভরপুর, প্রকৃতিও যেন এই আনন্দে সামিল। শুধু মানুষই নয়, গাছ, পাখি, নদী

(যমুনা), পশু, হাওয়া ও যেন আনন্দে কলতান করে চলেছেন। এ যেন এক নতুন জগৎ, যে জগৎ ভক্তিভাবে জগৎ মাঝেই দিব্য জগৎ-এর বাতাবরণ রচনা করে তুলেছে। যে জগৎ-এর কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন ভগবান আর তাঁকে ঘিরেই বসে চলেছে নিত্যদিন যাপন।

কৃষ্ণ কানাইয়া ভগবানের বৃন্দাবন পর্বের পরবর্তী অধ্যায়-এর সূচনা এবং মহাভারত পর্ব পর্যন্ত ভগবৎ প্রকাশের নাম। ভক্তগণের হৃদয় স্থায়ী রূপে আসীন হয়ে অক্রুরের রথে করে এগিয়ে চলেছেন মথুরার পথে, যেখানে তাঁর অধর্মের বিনাশ পর্বের সূচনা হবে এবং কর্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ন্যায়-এর মধ্যে দিয়ে ধর্মস্থাপনার পথের প্রথম চরণ-রচনা হবে। ভগবানের এই যাত্রা পথে ভগবান কখনো নিজে সংহার করেছেন আবার সংহার করার পরিস্থিতি রচনা করে দিয়েছেন। বাইরে প্রচণ্ড সংহারক কিন্তু অন্তরে দয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে মুক্তি দেয়েছেন প্রতিটি প্রাণকে। যে প্রাণ অন্যায়ের পথে অত্যাচারের পথে জগৎকে শাসন ও শোষণ করে চলেছে তার অবসান ঘটিয়ে সুশাসন ও ধর্মস্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাঁর যাত্রা। এই যাত্রায় ভগবান তাঁর কানাইয়া রূপকে অন্তরে ধারণ করে কৃষ্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন জগৎ মাঝে। যখন ভগবান কানাইয়া রূপে বাঁশি বাজাতেন বৃন্দাবনে সেই চিরসঙ্গী বাঁশিও স্থান পেয়েছে তাঁর পরবর্তী যাত্রা পথে। দ্বারকা নগরীর স্থাপনা হয়েছে, দ্বারকা নগরী সমৃদ্ধ হয়েছে, নারায়ণী সেনা গঠন হয়েছে, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল বধ হয়েছে। সেই সময়ের রাজনীতির অংশ রূপে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ হাতে। দ্রৌপদীর সখা রূপে তাঁকে ক্রমশ গঠন করেছেন ভবিষ্যৎ-এর আসন্ন ক্রান্তিকালের মূল উপাদান রূপে। অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন পথ দেখিয়েছেন বিভিন্ন সময়। কর্ণের প্রতি ছিল তাঁর সাবধান বাণী। এই ভাবে পঞ্চপাণ্ডবকে বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধের জন্য মানসিক ভাবে এবং রণনীতির উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করলেন ধর্মস্থাপনার মূল কাণ্ডারী রূপে। যতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবের মিথ্যে মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়া এবং সেখান থেকে নৈমিষারণ্যের দিকে প্রস্থান করা, তারপর দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় আবারও পঞ্চপাণ্ডবের আত্মপ্রকাশের অভ্যন্তরে তাঁরই ভবিষ্যৎকে রচনা করা। ইন্দ্রপ্রস্থকে সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব, সমৃদ্ধিতে ভরপুর করে তোলার পিছনে ভগবান স্বয়ং, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে পৌঁছে দেন এবং প্রেরণ করেন বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন প্রান্তে যা পরবর্তী যুদ্ধের পটভূমিতে একটি রণকৌশলে মূল ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সভাপর্বে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন এবং ধর্মযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয়ে যায়, তারপর, বনপর্ব এবং অজ্ঞাত বাসে বিরাট রাজার দরবারে পঞ্চপাণ্ডবের আত্মগোপন ভগবানেরই সরাসরি যোগ এবং সব শেষে যুদ্ধের প্রাঙ্গণে যুদ্ধের প্রধান নায়ক রূপে যুদ্ধ পরিচালনা।

ভগবানের হাতে ছিল না অস্ত্র কিন্তু তিনি রথের রশ্মিকে ধরলেন। যেমন ভাবে, যে জীবন ভগবানের চরণের শরণ নিয়েছেন তাকে যেমন ভগবান হাত ধরে নিয়ে চলেন তেমনই ভগবান, অর্জুনের রথের সারথী হয়ে মহাযুদ্ধের সারথী হয়ে উঠলেন। অর্জুনের সাথে সাথে সমগ্র সংসারকে ভগবৎ জ্ঞান প্রদান করলেন বিভিন্ন পর্যায় পর্যায়। আত্মার জ্ঞান, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ভগবৎ রূপ দর্শন করালেন এবং মহাভারতে অন্তিমে ন্যায় ধর্মকে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন ভবিষ্যৎ-এর রাজসিংহাসনে, মাতৃ গর্ভে রক্ষা করলেন। নবজীবন দান করলেন ভবিষ্যৎ-এর চক্রবর্তী সম্রাটের। ভগবান ন্যায় প্রতিষ্ঠা, ধর্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে জগৎ-কে পথ দেখিয়েছে, সামগ্রিক রূপে জগৎ-এ ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছেন কিন্তু একই সময় অন্তরে ধারণ করেছেন সেই কানাইয়া যিনি ভক্তের ভগবান, তাইতো ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এমনকি দুর্যোধন, দুঃশাসন, অশ্বত্থামার অন্তিমেও তাঁদের ক্ষমা করেছেন। মুক্তি দিয়েছেন, ঠাঁই দিয়েছেন এই বিশ্ব সংসারে।

কৃষ্ণ কানাইয়া রণনিপুণ, দণ্ডপ্রদান কারী, ধর্মস্থাপক এবং প্রজাবৎসল আবার তিন বন্ধু, সখা, ভ্রাতা, গুরু রূপে জগৎ-এর মঙ্গল প্রদান করেছেন। হে ভগবান তোমার পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ কে জানাই প্রণাম।

—ঃঃ—

ভগবানই পূর্ণ সত্য

সায়ক ঘোষাল

একটি প্রকৃত ভগবৎ অভীলাষি মন জগতের মাঝে হয়ে ওঠে এক নিমিত্ত ভগবৎ কর্মর সম্পাদনের। কর্মের মধ্যে যখন জগৎ ভাব মিশে যায় তখন সে কর্ম হয়ে ওঠে দিব্য কর্ম। কর্মের ফল যাই হোক কিন্তু কর্ম হবে সর্বদা ভগবানে নিবেদিত। কর্ম হতে পারে অনিচ্ছাকৃত কিন্তু সেই কর্ম যখন ভক্ত তার আরাধ্যকে নিবেদিত রূপে সম্পাদন করে তখন সেই কর্ম একটি নিখুঁত কর্মে পরিণত হয়। পরম পুরুষ তিনি সদাসর্বদা রয়েছেন ভক্তের হৃদয় ক্ষেত্রে। সর্বত্র রয়েছেন তিনি, হৃদয় দিয়ে সেই অনন্ত ভাবের উপলব্ধিতে তাঁকে মন খুঁজে পাবে। এই ভগবৎ ভাবের হবে জীবন মাঝে একমাত্র অভীপ্সা। এই ভগবৎ ভাবের আকাঙ্ক্ষায় মন ক্রমশ উপলব্ধি করবে সেই হৃদয়রাজ। এই ভাবের হবে এখন নিত্য প্রকাশ জীবনমাঝে। এইভাবের খেলায় হবে উপলব্ধির নিত্য বিকাশ জীবন মাঝে। এই উপলব্ধির ক্ষণে জাগরিত হবে জীবন চেতন। এখন ভক্ত ভগবান মিশে যাবে জাগরিত হবে ভগবৎ চেতন স্বত্তা। এই জীবন চেতন হবে এখন পথ প্রদর্শক। এই জীবন চেতন তথা ভগবৎ চেতন এগিয়ে নিয়ে যাবে জীবনকে আরও অনন্তের পটভূমিতে যেখানে ভক্ত দেখবে নিত্য নবীন রূপ, নিত্য নবীন উপলব্ধি জগতের মাঝে। জীবন-মাঝে এসেছে দিব্য আকর্ষণ যে বার্তা হয়ে এসেছে প্রকৃতির দ্বারা ভক্তের কাছে বিকশিত হবার ক্ষণে। ভক্তের ডাকে ভগবান বারে বারে আসেন। ভগবান পরমপ্রিয়; ভক্তের কাছে পরম মাতৃকা তিনি শ্যামা মা হয়ে বিরাজ করছেন চেতনে চেতনে। জীবনের মহাপ্রাণ হয়ে উঠেছেন মম মাতৃকা। মাতৃভক্তির ক্রোড়ে জগতের মাঝে বিজয়ের ধ্বনি উত্থিত হবে ভক্তির অনন্ত সম্ভারে। কোনো কিছুই আর আটকাতে পারবে না ভক্তের এই

চৈতন্যময় অবস্থা। এই চৈতন্য অবস্থা ভক্ত কর্ম সম্পাদনে নেমে পড়বে এই মহা মাতৃকাকে কর্মের নিবেদনে। চৈতন্যের প্রকাশের এই ক্ষণে মায়ের আশীর্বাদ থাকবে ভক্তের কাছে কবচ হয়ে। জগতের কোনে বাধা তাকে দূরে সরাতে পারবে না বা তার চৈতন্যের বিকাশে বাধা দিতে পারবে না। জীবন এখন হবে সাবলম্বি পারমার্থিক উদ্দেশ্যকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে। এই পারমার্থিক উদ্দেশ্যকে ভক্তমন এখন সফল করার জন্য কর্মে লেগে পড়বে পরম পুরুষেরই সাহায্য নিয়ে। এই জগতে ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক এক ও অভিন্ন সত্য। ভক্ত হয়ে উঠবে এখন একটি সুবাসময় পুষ্প। একটি পুষ্প যেমন তার কর্ম করে প্রস্ফুটিত হয়। জগৎকে নিজের রূপে মুগ্ধ করে, সুবাসের দ্বারা স্নিগ্ধ করে ঠিক সেরকমই এই ভক্ত কর্ম করে চলবে একটি পুষ্পের ন্যায়। ভক্তমন এখন মানবিক এই পার্থিব ভাবনার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে দৈবী মনভাবে প্রবেশ করেছে। দৈবী চরিত্রের অনন্যতার হাতছানি এসেছে জীবনমাঝে সদা বিকাশের ক্ষণে। এমন করে জাগরিত ভাব প্রকাশের মাধ্যমে জীবনের কর্মের পটভূমি, নিবেদিত হোক প্রতিটি কর্ম ভগবৎ চরণে।

—ঃঃ—

সবটা নিয়েই একটা রে মন

মনোজ বাগ

ব্যক্তি লক্ষ্যচ্যুত হয়, ভ্রষ্ট হয়। ব্যক্তিজীবন পাকেচক্রে পড়ে, স্থির ভাবনা থেকে সরে এসে ব্যক্তিগত সুবিধা মতো পরিবেশ, পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। সীমিত ভাবনার হওয়ার কারণে ব্যক্তির কর্মকাণ্ড বিরাট পরিসরের হলেও শেষ পর্যত তা নির্দিষ্ট কালসীমার পর অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে যায়। বৃহত্তর ভাবনার কথা ভুলে, ঈশ্বরীয় সত্যটি অস্বীকার করে, নিজস্ব প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে, কোন মন-গড়া জগৎ বানিয়ে, সেই জগতের অধীশ্বর হবার দুর্বাসনাও ব্যক্তি মানুষ করে। পরিণামে প্রকৃতই যা হবার, তা না হয়ে প্রাপ্তি হয় অন্য। কখনো তা হয় কাঙ্ক্ষিত পরিণামের ঠিক বিপরীতে। ফলে প্রভূত সময় নষ্ট হয়। সাধারণ মানুষ সেই আবহে থাকলে, তারাও হয় বিভ্রান্ত।

ঈশ্বরের এমনটা হয় না। ঈশ্বরের লক্ষ্যচ্যুত হবার কোন সুযোগ থাকে না। ঈশ্বরের ভ্রষ্ট হওয়াও হয় না। কারণ তাঁর কর্মকাণ্ড কোন বিশেষ কিছুকে লক্ষ্যে রেখে হয় না। তিনি কোন বিশেষ কিছুতে গেঁথেও রাখেন না নিজেকে। সর্বব্যাপি তাঁর অবস্থান, সর্বত্র তাঁর গতি। সর্বাতিশায়ী তিনি। এর ফলে তাঁর কর্মসূচী সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জোড়া। তিনি নিজে স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় পরোমুখাপেক্ষিতা বা পরনির্ভরতা তাঁর মধ্যে থাকেও না। একটা ক্রিয়া তাঁর ভিতর সদা বর্তমান থাকে এবং এটিই তিনি, যা তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়েই বর্তমান। মহাসমুদ্রের কোন এক প্রান্তে সুনামি হলে সারা বিশ্বে তার কাঁপন ধরে। মহাব্যোমের ঘটনাও আমাদের প্রভাবিত করে। আমাদের প্রভাবিত করার কারণ আমরা তাঁর অন্তরে অবস্থান করি। আবার তাঁর সমগ্র অস্তিত্বটাই যেহেতু তিনিই, তাই তাঁর অন্তরে ঘটে চলা কোন কিছুর থেকেই তাঁর পালিয়ে বাঁচার উপায় নেই। তিনি পালানও না। পালিয়ে যাবেনই বা কোথায়?

ফলত তাঁর সবটা নিয়েই তাঁর থাকা। নিজের সুবিধা মতো নিজে কিছু করা বা নিজের জন্য কিছু করা বা অন্যের জন্য কিছু করা—এই ধরনের আত্মতুষ্টিকারী সীমিত পরিসরের ভাবনারাজি ঈশ্বরে অবর্তমান। কারণ তাঁর নিজেরটাও তাঁর সবটা নিয়েই। মা-র নিজের, মা-র গোটা সংসারটাই। "মা-র আবার আমার তোমার"। কানাটাও তাঁর, ভালোটাও তাঁর। গোড়াটাও তাঁর, কালাটাও তাঁর। মা-র গোনাতে যা বিগত হয়েছে সেটি যেমন থাকে, পেটেরটাকেও তিনি গুনতিতে বাদ দেন না। আনলোকে ঘরের সদস্য গণনা করলে পোয়াতি বৌয়ের পেটের বাচ্চাটোকে গুনতিতে রাখেন না। সরকারি আদম সুমারি মৃত ব্যক্তি আর যে ফুলটি এখনো বাহ্যত ফোটেনি তাদের হিসাব কখন রাখে না। মা-র ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। মা তাঁর সবটা নিয়ে থাকেন। সবটাই যে তাঁর অন্তরের ধন। সবটাই যে তাঁর চোখে ভেসে থাকে। ঈশ্বরেরও এই এক দশা। তাঁর সবটা ত্রিকাল নিয়ে। সবাইকে নিয়ে।

ঈশ্বরের তাই কোন একান্তের ব্যক্তি বাসনা নেই। কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নেই। আবার নিজ ভিন্ন অন্য বোধও নেই। কী করে থাকবে? তাঁর যে নিজের ছাড়া অন্য আর কিছুটি নেইও। তাঁর আছে শুধু মাত্র তাঁর নিজের। এই নিজের তাঁর ভিতরেরই পূর্ণতা। এই নিজের তাঁর সমগ্রতার বোধ। বোধটি যেহেতু অন্য কিছুতে বা অন্য কারোতে আশ্রিত নয়, তাই অন্য কিছু কী অন্য কারোর দ্বারা আক্রান্ত বা প্রণোদিত বা প্ররোচিত হওয়ার সুযোগ এখানে নেই। এটির কোন তর-তম অবস্থাও কখনো থাকে না। জগতে জামানা বদলায়। দেশে দেশে রাজ্য বদলায়। রাজা আসেন। রাজা যান। জগতে কাল বদলায়। কারণ সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি মতো জীবনকে, জগৎকে ঢেলে সাজায়। আমরা দেখি। আমরা সময়ের পরিবর্তনের শরিক হই। এই পরিবর্তনও মহাবিশ্বের তুলনায় সীমিত পরিসরেই হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, " I will do root and branch reform" । আমি আমূল পরিবর্তন করব। মৃত্যু শয্যায় স্বামীজীর শেষ কটি কথার মধ্যে একটি ছিল, "একজন বিবেকানন্দ কী করে গেল, এরা এখন কল্পনাও করতে পারবে না। তবে আমার বিশ্বাস আগামী কালে আমার মতো বিবেকানন্দ অনেক আসবে"। আজও সারা বিশ্ব জুড়েই মানব সমাজে তার প্রভাব আছে, আগামী দিনেও থাকবে। এতৎ সত্বেও যা বাস্তব, বিরাট পুরুষেও ব্যক্তিত্বের সীমা থাকে। সে সীমার আবদ্ধতা ছাড়িয়ে যাবারও ক্ষণ আসে। তাতে ক্ষতির কিছুই নেই। তাঁরাই রাস্তা তৈরি করেন। যে কোন রাস্তাই এই মহাজনদের পায়ে পায়েই প্রথমে তৈরি হয়। যাকে বলে ডহর। সেই ডহর সময়ের প্রয়োজনে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, আরো আরো ওজস্র, অগণন মহাজনদের

মহৎ-শ্রমে। আজকের বিশ্বমানব সমাজ অগুনতি মহা মনীষীর তপস্যারই পরিণাম। তাতে সাধারণ মানুষের অবদান অনস্বীকার্য নয়। সাধারণ মানুষ যুগে যুগেই মহামানবদের সঙ্গে থাকেন তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে।

তবুও এই বিশ্ব মহাবিশ্বের কতটুকু স্থানে অবস্থান করে? আবার এও শোনা যাচ্ছে, আজকের পৃথিবীর গঠন আগামী দিনে বদলে যাবে। সেই পরিবর্তনের ক্ষণে কী হবে এ বিশ্বের পরিণাম? কত হাহাকারের বিনিময়ে সাধিত হবে তা? যদিও সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়েই সৃষ্টির অপার আনন্দের সঙ্গেই আছে সৃষ্টির অপার হাহাকারও। মাইক্রো-তে আছে, ম্যাক্রো-তে আছে। এই হাহাকার ওঠে লাভ-ক্ষতির নির্ণয় বোধে বোধ হলে। যার সেই বোধই নেই তার ভিতরে হাহাকারের অনুভব জাগবেই না। এই নির্ণয় মাইক্রো-ম্যাক্রো, অতিসূক্ষ্ম থেকে বিরাট সবেতেই আছে। মাইক্রোতে যা সূক্ষ্ম, ম্যাক্রোতে তা-ই বিরাট। জগতে সবেরই এই মাইক্রো-ম্যাক্রো (micro-macro) হয়। ঈশ্বরের কোন মাইক্রো-ম্যাক্রো হয় না। কারণ তিনি সবটা। তাঁর টুকরো হয় না।

—ঃঃ—

সৃষ্টির মূলে ভগবান

রীতেন বসাক

ভগবান হলেন শক্তি ও স্থিতির যুগপৎ মেলবন্ধন। তিনিই হলেন জগৎ এর সমস্ত ক্রিয়া কলাপের শক্তির উৎস—তা সে জগৎ কর্মই হোক কিংবা ব্রহ্মকর্ম হোক, জীবনের শক্তিই হোক কিংবা সাধনের শক্তি হোক। অন্যদিকে আবার এই সমগ্র জগৎকে তিনি ধারণ করে রেখেছেন, বেধে রেখেছেন এক শৃঙ্খলায়— আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন সব কিছু স্থির, যে যেখানে আছে—এ যেন এক পরম যোগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন।

ভগবানের এই শক্তিরূপকেই আমরা কালী বা দুর্গা মাতৃরূপে আরাধনা করি। আর সেই পরম স্থিতি। পরম যোগ-এ যিনি আছেন তাকে শিব বা মহাদেব রূপে বন্দনা করি। শক্তি ও স্থিতি একে অপরের পরিপূরক। যে কোন শক্তির উৎসই হল স্থিতাবস্থায় সেই শক্তির সঞ্চয় বা শক্তি অর্জন। স্থিতাবস্থায় যে শক্তি অর্জন হয় তাই দিয়েই হয় পরবর্তী কার্যকলাপ। তাই একেকটি সৃষ্টির সূচনা হয় মহাশূন্যতা থেকেই।

সনাতন ধর্মে শিব ও কালীর যুগপৎরূপটির পূজা হয় সর্বত্র। শক্তি ও স্থিতির প্রকৃত মেলবন্ধন বা সহাবস্থানরূপ এটি। কে কবে এই রূপের পূজা শুরু করেছিলেন জানি না, তবে এটিই সৃষ্টির fundamental element যেখানেই মা কালীর মূর্তি রয়েছে, সেখানেই রয়েছেন শিব ঠাকুর।

সাধন পথের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভগবান লাভ করা। কিন্তু সেটি সহজলভ্য নয়। ভগবান লাভ তো আর হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই হয়ে গেল। এর জন্য লাগে সাধকের অফুরন্ত ধৈর্য্য আর মন ও প্রাণের সহযোগ। সাধকের সংগ্রাম বাইরের পরিস্থিতির সাথে নয়, অন্তরের বিরুদ্ধ ভাবের সাথে। এরজন্য লাগে মনের শক্তি ও পরিস্থিতির সাথে জুঝবার জন্য শক্তি। এই সাধন শক্তি পাওয়া যায় একমাত্র ভগবৎ কৃপা থেকে। তাই আমরা করি কালী মাতৃরূপের আরাধনা। মা যদি কৃপাবশত আমাদের সুমতি দেন আর পথ দেখান—তবেই আমরা এগোতে পারব সাধন পথে, টিকে থাকতে পারব এই ক্ষুরস্যধার পথে। এবং এক সময় পাব ভগবানকে—শিবরূপকে। সাধক সাধন শেষে শিবত্ব লাভ করবে, তার মন প্রাণ হয়ে যাবে শিবময়। ভগবানের শক্তি ও স্থিতির যুগবৎ রূপের এক রূপের (শক্তি রূপের) আরাধনা থেকে প্রাপ্ত কৃপায় সাধক পেয়ে যাবে আরেক রূপের (স্থিতি রূপের) সন্ধান।

এই জগৎ কর্মময়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও প্রতি নিয়ত চলেছে বেড়ে। ভগবানও নিয়োজিত রয়েছেন নতুন সৃষ্টিতে। নতুন সৃষ্টিতেই রয়েছে আনন্দ। তেমনি সাধন পথেও রয়েছে ভগবানকে নতুন রূপে উপলব্ধি করার আনন্দ। কাল যেভাবে ভগবানের উপলব্ধি পাওয়া হয়েছিল আজ আবার তাকে নতুন ভাবে জানা গেল—তাকে জেনে উঠবার শেষ নেই, তিনি নিত্যই নবীন। ঋষিরা তাই বলেছেন ব্রহ্ম কখনো এঁটো হয় না, অর্থাৎ ভগবানকে জেনে শেষ করা যায় না। আর এটাই সাধন পথের আনন্দ। এই জানার চেষ্টাই সাধককে ভগবানের সাথে আটকে রাখে ভাবনায়, চিন্তায় কত ধারা আছে তাকে জানবার—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম আরো কত কি। আবার সব ধারার মধ্যে দিয়ে জানা হয়ে গেলেও থেকে যায় তাকে অপরিসীম অজানা। তাকে জানার প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই কত নতুন নতুন ধারার। তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। তিনি কালের দ্বারা সীমায়িত নন—তাই কালের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাকে নবীন রূপে জেনে নিতে হয় সেই সময়ের নিরীখে। আমরা ভগবান শিবের ধ্যানস্থ রূপটি দেখে থাকি—সেখানে দেখা যায় ভগবান স্বয়ং নিজের ধ্যানে নিজে মগ্ন, তিনি স্বমহিম। তার ধ্যানের মধ্যেই সমগ্র সৃষ্টির প্রেরণা নিহিত রয়েছে। তার ধ্যানের মধ্যেই সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই জগৎ এক প্রকাণ্ড কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে যেখানে সকল দৃশ্যত গ্রহ, নক্ষত্র ও অদৃশ্যত বিভিন্ন মহাজাগতিক শক্তি তরঙ্গ প্রতি নিয়ত বিভিন্ন কর্মে রয়েছে নিয়ত। তাই ভগবানকে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তার এই জগৎজোড়া কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। কর্মের মধ্য দিয়েই ভগবানের উপলব্ধি লাভ করা। ভগবানের কর্ম মানে Selfless কর্ম। তাই প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে Selfless কর্মে নিয়োজিত থেকে ক্রমান্বয়ে ভগবানের উপলব্ধির রাজ্যে বিচরণ করতে পারবে। নিজেকে পারবে এই Cosmic truth এর সাথে একাত্ম করতে। কর্মে মন focused থাকলে সেই মন খুব তাড়াতাড়ি ডুবে যেতে পারে ভগবানের ভাবনায়। মনকে কাজের বাইরে বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখলে সেই মনে নানা এলোমেলো

ভাবনা ভীড় করে। কিন্তু কাজের মধ্যে থাকলে মন একমুখী বা একাগ্র থাকে। তখন সেই মনকে কাজের, ফাকে বা কাজের শেষে ভগবানের ভাবনার সহজেই নিয়োজিত করা যায়। ভগবান লাভ কোন এক দিনের বিষয় নয় যে over night হয়ে যাবে, এটি দীর্ঘ দিনের একাগ্র প্রয়াসের বস্তু এবং এর কোন শেষ নেই, আছে শুধু শুরু। যিনি ভগবানকে ভাবনার প্রয়াস করে কর্মের মধ্যে আছেন তার তখন জগৎকর্ম ব্রহ্মকর্ম এক হয়ে যায়। তার আর আলাদা করে পূজা-অর্চনা বা ritual এগুলোয় প্রয়োজন থাকে না। আমাদের শাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের ঋষিদের কথা বর্ণিত আছে, যেমন —মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি—এই সকল ঋষিরা সমাজে বিভিন্ন রকম কাজে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কাজ বা দায়িত্ব অনুযায়ী তারা মহর্ষি বা রাজর্ষি উপাধি পেতেন। যেমন রাজর্ষি, তিনি একাধারে রাজা আবার ঋষিও বটে। তিনি রাজকর্ম করছেন সত্য ও নিষ্ঠার পথে থেকে। জগৎ এ প্রতিটি মানুষই ঋষির মত চরিত্রের হয়ে উঠতে পারেন যদি জীবনে সত্যকে ধারণ করেন এবং চর্যা করেন।

—ঃঃ—

“মন চলো নিজ নিকেতনে”

পার্থ সুন্দর ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন “পূজা তার সংগ্রাম অপার” এখানে পূজা অর্থাৎ ফুল, মালা দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে পূজা নিবেদন নয় এখানে পূজা অর্থে মনের মধ্যে সংগ্রাম। মনের মধ্যে সর্বদা দেব ও অসুরের সংগ্রাম চলছে। আসুরিক শক্তি সর্বদা বেশী করে প্রভাব বিস্তার করে। সর্বদা পরাজয় হতে থাকে দেবভাব। স্বার্থ, সাধ, মান বজায় রাখতে গিয়ে দেবভাবের পরাজয় হতে থাকে। তাইতো মনের মধ্যে এই আসুরিক শক্তিকে পরাজয় করতে হবে। সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ভগবানের নাম করতে আনন্দ হচ্ছে কিনা। এটাই মাপকাঠি।

মানুষ বাইরে খুঁজবে ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য খোঁজবার জন্য তোলপাড় করবে। জীবন প্রাণপাত করবে। মানুষ জানবেই না। ঐশ্বর্য আছে তবে বাইরে নয়। ঐশ্বর্য আছে নিজের মধ্যে। নিজের অন্তরে। তাই তো নিজেকে জানতে হবে, চিনতে হবে। সর্বদা বিচার করতে হবে। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ। সৎ মানে নিত্য আর অসৎ মানে অনিত্য।

ঠাকুর বলেছেন ঃ যার বিবেক হয় সে জানে ঈশ্বরই বস্তু বাকী সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছে হয়। অসৎকে ভালবাসলে যেমন দেহ সুখ লোকমান্য, টাকা এইসব ভাল লাগে। কিন্তু ঈশ্বর সৎরূপ তাঁকে মানতে ইচ্ছে করে না। সদাসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছে করে।

ঠাকুর বলেছেন ঃ তিনি অন্তর্যামী, তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। অহংকার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও , সব পাবে।

কথামৃতর একটি গান ঃ

আপনাতে আপনি থেকো
মন যেও না কারু ঘরে।।
যা চাবি তা বসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তপুরে।।
পরম ধন ঐ পরশমণি
যা চাবি তা দিতে পারি,
কত মণি পড়ে আছে।
চিন্তা মণির নাচ দুয়ারে।

ঠাকুর বলেছেন যখন বাহির লোকের মধ্যে মিশবে তখন সকলকে ভালবাসবে, ও ব্যক্তি সাকার মানে নিরাকার মানে না ও নিরাকার মানে সাকার মানে না ও হিন্দু ও মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় এই বলে ঘৃণ্য করোনা। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের মিশবে যত দূর পারো, আর ভালবাসবে। তারপর নিজ ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ উপভোগ করবে। রাখাল যখন গরু চড়াতে যায়, সব গরু এক হয়ে যায়। যখন সন্ধ্যার সময় নিজ ঘরে যায় তখন পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে।

মনকে যে ঘরে রাখবে সেই ঘরে থাকবে। যে রঙে ছাপাবে সেই রঙে ছুপবে। যে রংয়ের কাঁচ দিয়ে দেখবে, দৃশ্য সেই রংয়ের বোধ হবে, মায়া আবদ্ধ মন, ঐশ্বর্যের বিভব, মান, পদ এই সবের অহংকার করে। পদ এইসবের অহংকার করে। এ সব দুদিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গান আছে ঃ

ভেবে দেখ মন কেউ কারুর নয়,
মিছে ভ্রম ভুমণ্ডলে
ভুল না দক্ষীণা কালী,
বদ্ধ হয়ে মায়া জালে,

যার জন্য মর ভেবে,
　　সে কি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া,
　　অমঙ্গল হবে বলে।।
দুই তিন, দিনের তরে ভবে,
　　কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দিবে ফেলে,
　　কালাকালের কর্তা এলে।।

সন্ধ্যার পর জোনাকী পোকা মনে করে সেই জগৎটা আলো দিচ্ছে। কিন্তু নক্ষত্র যেই উঠলো অমনি তার অভিমান চলে গেলো। কিছু পরে চন্দ্র যেই উঠলো, নক্ষত্র মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করল আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি; দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হলো, সূর্য উঠেছেন চাঁদ মলিন হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না। ধনিরা এইগুলো ভাবলে ধনের অহংকার হয় না।

মন কাজ করে। কাজ কারায়। মনেতেই বদ্ধ। মনেতেই মুক্তি, মন প্রতিজ্ঞা করে, কল্পনা করে, মন ভাবে, বিচার করে। মনটা প্রস্তুত করতে পারাটাই আসল কথা। সাধনকালে মনই প্রধান। ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা মনটি যেন তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে।

"শরণাগত দীনার্ত, পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্বসার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে" জয় নারায়ণী নমস্তুতে জয় নারায়ণী নমস্তুতে"

জয় মা জয় মা জয় মা।

—ঃঃ—

মা-এর ভালোবাসা

প্রণবেশ রায়

মা-এর ভালোবাসা অসীম, অপার, তিনি সনন্তানের জন্ম দেন, তাকে দেখাশুনা করেন, তার খাবারের ব্যবস্থা করেন, প্রয়োজনে তাকে শাসন করেন, বিপদ থেকে মুক্তি পাবার উপায় নির্ধারণ করেন। জাগতিক লোভ, লালসা থেকে মুক্ত হবার উপায় বলে দেন। তাই সন্তানের একমাত্র সম্বল হলেন মা। তিনি ছাড়া এই জগতে আপনার চেয়ে আপন আর কেউ নেই। তাই সন্তান মা নামে আত্মহারা, মা এর কাছে দুটো নাড়ু থাকলে তার সন্তানের জন্যই তিনি সেটা রেখে দেন। সন্তান খিদে পেলে খাবে। অসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করেন মা।

জাগতিক মা কে ক্ষণকালের জন্য লাভ করে সন্তান। তার জীবনকালে মা এর জীবনদ্বীপ নির্বাপিত হতে পারে। তখন কি তবে মা এর সঙ্গ থেকে সে বঞ্চিত হবে? না। কখনওই সেটা সম্ভব হবে না। তা আসলে মা'কে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। তাই সন্তান মা এর একটা অবয়ব তৈরী করে। সে মা-এর মত দেখতে। হয়তো সে জাগতিক মা এর মত কথা বলতে পারে না?। খাদ্য গ্রহণ করে না। অন্ততঃ চর্মচক্ষে সন্তান দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ মূর্তিকে সে 'মা' বলে ডাকতে পারে। তার কাছে মানব কষ্ট-দুঃখ জানাতে পারে। তাই সে মনে শান্তি পায়, বারবার সে ঐ দেবী মূর্তিকে 'মা' বলে ডাকে আর মনে মনে আনন্দিত হয়। তাই তৈরী হয় বিভিন্ন দেবীমূর্তি। যেমন— দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, সন্তান মাকে দেখে গেয়ে ওঠে—

"মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই
কাজের বোঝা ফেলে রেখে আয় সকলে নাচি গাই।"

সন্তানের মনে এখন আনন্দ আর ধরে না। আর মা সারদা তো বলেছেন— তিনি সতেরও মা আসতেরও মা। তবে তিনি সন্তানকে অসৎ হতে বলেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন সন্তান ভুল করলে মা এর কাছে আসতে পারবে না তা নয়। মা, তার সন্তানকে ক্ষমা করবেন কিন্তু ভবিষ্যতে সে মা এর আশীর্বাদে সংযত হবে এতো অবশ্যম্ভাবী।

মা সন্তানের দুঃখ মোচন করেন। তিনি তার দুশ্চিন্তা দূর করেন। এক ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা একটু খারাপ হঠাৎ পাড়ার ছেলেরা তার কাছে আবদার করল যেল পাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোয় তাকে ১০ কেজি দেরাদুন রাইস দিতে হবে। তখন ঐ ব্যক্তি ভাবল যে স্বয়ং মা কৃপা করে ঐ ব্যক্তির কাছে পুজোর এই উপাচার গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তখন আর্থিক অসুবিধা ভুলে সে আশি টাকা কেজি দরে দশ কেজি চাল কেনে। হঠাৎ সে ভাবে তার মা তো ভিখারিণী নন। তিনি তো রাজরাণী। তাই মা একটা মালা পড়বেন — এটা ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা হয়। সে একশো টাকা দিয়ে মা এর জন্য একটা মালা কেনে। তার মোট খরচ হল নয়শো টাকা। ঐ দিনই তার একটা সুযোগ আসে প্রতি মাসে দু' হাজার দুশো টাকা রোজগার করার। তার বিশ্বাস এই ব্যবস্থা মা-ই তাকে করে দিয়েছেন। এটা তার নিজস্ব বিশ্বাস। তার নিজের অনুভব। অন্য কোনো ব্যক্তি এটা বিশ্বাস নাও করতে পারে। সে ভাবে এই আমার মা। তার দু'চোখে তখন জল। সে অবাক হয়ে যায় সে তো মা এর কাছে চায়নি। মা তার কষ্ট বুঝেছেন। আর কষ্ট বুঝেছেন, আর বুঝবেন নাই বা কেন? তিনি তো মা।

—ঃঃ—

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

এই জীবজগৎ আর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে
থাকা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তমঃ
সত্ত্বগুণের অধিকারী মানুষদের প্রকৃতি
ধার্মিকতা, বিশুদ্ধতা, ভারসাম্য, সত্য, শান্তি।
রজোগুণ গতি, কর্ম, আবেগ, আকাঙ্ক্ষার
অহংকার, কার্যকলাপের, চালিকাশক্তির
প্রতীক, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের জন্য কর্মে আসক্তি।
তমোগুণের প্রকৃতিতে জড়তা, অজ্ঞতা, অলসতা
নিষ্ক্রিয়তা, অন্ধকার প্রতিনিধিত্ব করে।
তিনটি গুণই সাথে মিলেমিশে থাকে
কখনও সত্ত্বগুণ রজো আর তমোগুণকে ছাপিয়ে যায়।
কখনও রজোগুণ তমো আর সত্ত্বের ঊর্দ্ধে প্রাধান্য পায়
কখনওবা তমোগুণ সত্ত্ব আর রজোগুণকে ছাড়িয়ে যায়।
ভাবি, কীভাবে এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বন্ধন থাকে
মুক্ত হই, মুক্তি পাই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি থেকে
শরীর থেকে মনের গতিপ্রকৃতিকে আলাদা করে
কিছুতেই মনের অনুগামী হওয়া যাবে না।
তাতে দূরীভূত হবে সব ঋণাত্মক চিন্তা ভাবনা
ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই নিয়ন্ত্রক
তিনিই নিয়ামক—আসক্তিহীন হয়ে ফলের
আশা না করে তাঁরই ভাবনায় তাঁরই চিন্তায়
তাঁরই কর্ম করা আন্তরিকতার সাথে
ভগবানের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাওয়া
দিব্য আলোয় প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হওয়া।

—ঃঃ—

ঋষির প্রজ্ঞা ব্রহ্মধনে নিহিত

মানবেন্দ্র ঠাকুর

এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ভগবান দ্বারা আচ্ছাদিত তাহলে তোমার আমার সকল দেহ ভগবানে আচ্ছাদনে আছে। আবার ঈশ্বর বলেছেন যে আমি ভক্তবর্গের হৃদয়ে সতত বিশ্রাম করি। বোধকরি তাই মনুষ্য হৃদয় দেবতার মন্দির। কিন্তু "জীবন ধারণের জন্য কোন ধন, জরুরী। জড়ধন না ব্রহ্মধন? আধুনিক মন উত্তর দেয় 'জড়ধন'। ঋষির উত্তর ব্রহ্মধন। জীবন হয়ে উঠুক ধী। বহুল সম্পদ তার হোক। বাড়বাড়ন্ত এমন হোক এ ধরণের যেন উপচে পড়ে। নিজে ডুবে গিয়ে অন্যকেও ডুবতে ডেকে নেয়। ব্রহ্ম ধন জীবনের নতুন পরিচয় দেয়। নতুন মাত্রা পায় জীবন এর দ্বারা। ঋষির প্রজ্ঞা সর্বদা ব্রহ্ম ধনে আকাঙ্ক্ষা করেছেন। ঋষি ব্রহ্মপথের পথিক। ঋষি ক্রমাগত এগিয়ে যেতে চান ব্রহ্ম পথে। একটির পর একটি পর্বে। ক্রমে ব্রহ্ম মার্গ আরোহন এখানে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ। যা কিছু প্রাপ্তি যোগ্য সবই রয়েছে এপথে। যে চায় যে অনুরূপ পায়। যে চাইতে ভুলে যায়, অথচ চাওয়ার বাসনা অন্তরে, সেও পেতে পারে। যে চাইতে চায় না, চাওয়ার দিকে কোন মন নাই, তারও রয়েছে অফুরন্ত উন্মুক্ত ভাণ্ডার। এ পথে কুড়িয়ে নাও মন যেমন চায়, তেমন করে। ধর্ম রয়েছে এ পথে। অর্থ, কাম আর মোক্ষ রয়েছে এ পথে। শুধু তাই নয়, মোক্ষেরও অতীত, অতিরিক্ত রয়েছে। রয়েছে ভালোবাসা, প্রেম পরমের প্রতি। মোক্ষ অতিক্রমী, মোক্ষ পর্ব ছাপিয়ে এগিয়ে গিয়ে এই ভালোবাসা, প্রেম পরম প্রকাশ ঐ ভালোবাসার লক্ষ্য। এপথ দিয়ে এগিয়ে সব পাওয়া যায়।

ধর্মের পথ যে করেছে বরণ, জীবন হয়েছে সুচারু। ব্রহ্মলাভ হয়ত হবে না শুধুমাত্র ধর্ম পালনে, কিন্তু জগতের জন্য এক অনুপম বার্তা সে বহন করে। যা কিছু সমীচীন, যা কিছু জীবনের জন্য বরণীয় তাকে নিয়েই এগিয়ে চলো। ঐ পথ জগতের জন্য সুবিচারী সবার জন্য না হলেও বেশির ভাগের জন্য এপথ সুবিচারী। ধর্মপথে সন্ধান পাওয়া যাবে পরমের। সাক্ষাৎ হওয়া বহু দূরের কথা। খোঁজ মিলবার পর যদি আগ্রহ জেগে ওঠে তবে এগিয়ে পড়। ধর্মপথ ধরে এগিয়ে পড়। ধর্মের জাগরণে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ভগবান স্বয়ং আগ্রহী। তিনি নিজেই আগ্রহ করে এগিয়ে নিয়ে চলবেন। ধর্মপথ প্রতিষ্ঠা করতে কতই না ত্যাগ তিনি বরণ করেছেন। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন পত্নী উদ্ধার তরে। ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধর্মরাজ্য হয়েছে বিভীষণের, ভরতের। রাজত্বের বলী হয়েছে 'অধর্মের বিনশ, ধর্মের প্রতিষ্ঠা।' ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন পঞ্চপাণ্ডবকে দিয়ে। যুদ্ধে বিজয়ী ধর্মপুত্র সভ্রাতা রাজত্ব নিয়েছেন। ধর্মরাজের ধর্মের রাজত্ব। প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তিনি। একবার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পর আর কোথায় তিনি চলেছেন কালের ছন্দে। অন্য উদ্দেশ্যের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা ধর্মরাজের রাজত্ব এই অন্য উদ্দেশ্যকে চরণ করে চলুক এগিয়ে ধর্মের প্রাণ চাঞ্চল্য যতো সময়ে থাকবে সে পর্যন্ত। যে জীবন এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে জীবনই ধর্মময় জীবন হয়ে ওঠে। ধর্ম জীবন ভগবানের বার্তা শোনায়। তাকে আহ্বান করে ভগবানের পথে। এগিয়ে চলতে আমন্ত্রণ জানায়। ধর্ম রাজত্ব যেন একটিকালের জংশন। এমনি থেকে কালের গতি বিভিন্ন স্রোতে, বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়। ধর্মপথে যোজনা করে কালের রথের সারথি হয়ে জীবন এ যেতে পরে ব্রহ্ম অভীপ্সার। অর্থের অর্থের পথ ভিন্ন। এর্থর অন্বেষার যিনি যেতে চান, তিনিও স্বাগত। অর্থের পথ নানাভাবে সূচিত হয়। জীবনের অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে জগতের সাপেক্ষেই সবচেয়ে বেশি কথা হয়েছে জগতের সাপেক্ষে জীবনের অর্থ। অথাৎ জগৎ ও জীবন ব্যাপী যে বিপুল সত্তার তারই সন্ধান। সে পথে সাফল্য। জগতের জ্ঞানি বিদ্যা, কলা, কুশল, জগতের সব বিষয়

এখানে গুরুত্বের। এই জীবনের চমক রয়েছে। এ জীবনের মধ্যে বিজয় অভিযান রয়েছে। রয়েছে বিবিন্ন মাত্রার প্রতিযোগিতা। এ জীবন নানাভাবে ভরিয়ে দিতে চায় ঐ পথকে। বরণ করতে চায় সে পথকে। যে পথে রয়েছে অজানার আহ্বান, যে পথের ঠিকানা জানা রয়েছে অথচ অতিক্রম করা হয়নি। যে পথ মনের আনুকুল্য, প্রাণের আনুকুল্যের। যে পথে হৃদয়ের আহ্বান। অর্থ খুঁজে এগিয়ে যেতে পার এর যে কোন ভাবে, জীবন ধন্য হবে। জীবন গর্বিত হবে। জীবনের আসবে নানা পর্যায়ের বিষয় সাফল্য। ঐ জগতের অসীম ভাণ্ডাররাজী থেকে তোমার উপযুক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে নাও। প্রশ্ন হল, কোন পথে করবে কাজটি? ধর্মের না চ্যুতির পথে? ধর্মচ্যুতির পথে যদি আহরণ করা হয় সম্পদ তবে সেটি প্রত্যাগত নিয়ে আসবে কর্মফলের পথে। আর ধর্মপথে যেটি আহরণ করা হবে, সেটি হবে স্থায়ী ফলদায়ী। আত্যন্তিকে সম্পদের প্রকৃত অধিকারী যিনি সম্পদ ভোগ করেন। কিন্তু সম্পদের মালিক যে ব্যক্তি যিনি সম্পদকে স্বজন করেছেন, বাড়িয়ে নিয়েছেন, লালন করেছেন। সম্পদ সৃজনের পিছনে তাঁর কর্তৃত্বটি বলবৎ থাকে ততক্ষণ, যত সময় পর্যন্ত সম্পদ স্বকৃত পথে সামর্থ্যের অধিকারী না হয়ে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

Question for Divine

Sweta Kumari

The Quest for God
(Bhawan ki Khoj)

This phrase captures the idea of seeking a deeper undetstanding on cannection with a higher power divine being or ultimate reality.

Quest mean to me?

1. Spritualgrowth
2. Seeking answers to life's mysteries?
3. Finding purpose or meaning.

The quest for God or a higher pawer can be a deeply personal and meaningful journey. It can involve :—

Self discovery :— It Explorng one's own beliefs values, and sprituality.

Spiritual practices :— Engaging in motion, prayer, or other rituals.

Connection :— A felling of unit with something greater.

The process of understanding the God.

Understanding God is not instant it is gradual process. This part spiritual growth, the roles of faith reason, and experience and religious texts, meditation and life wents people shape one's comprehension of the divine.

Spiritual exploration :— Seeking answers through various spiritual practices, texts and teachings. Self reflection, one's own beliefs, values and experiences. Open mindness, considering different perspectatives and interpretations. Being present in the moment, aware of thoughts and emotions.

Glimpses of the thoughts and theories Meeting the Matching Realization.

This section presents various philosophies and spiritual theories like vedanta, sufism, Christianity etc. and how they align with or differ from personal realizations. It will show ideas from scriptures and saints meet inner experiences and awaken deeper understanding.

The Message as an excerpt of the practice and future directions for the God seeker.

Here, we discuss on how to live teh realization in daily practice. The key disciplines or practices (meditation proyers, service), lessons should a seeker carry forward.

Suggestive future directions for human society.

Based on divine understanding future vision can be imagined for humanity. This section will support suggests, a spiritual foundation for peace, equality and justice progress and development in light of inner realization and a society aligned with higher values and universal love.

Miscellaneous :— This may include additional reflections, poems, stories, personal experiences, or quotes that don't fit directly into the section above but support the overall them.

—:—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH **REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027**
1st January 2026 **Regn. No. WBBEN/2006/18733**
Poush–1432
Vol. 23. No. 9 **Price : Rs. 5/-**

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৪ঠা জানুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১১ই জানুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৮ই জানুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৫শে জানুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.